ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল

১৪০৪ঃ ৫

বাংলাদেশে দর্শন চর্চা
● সোলায়মান আলী সরকার

উস্‌কুনীঃ নজরুলের অসংকলিত রচনা
● প্রীতি কুমার মিত্র

বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণঃ ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব
● মলয় কুমার ভৌমিক

রাজশাহী চিনিকল লিমিটেড-এর চিনি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ
● মোঃ শামসউদ্দীন

বিবাহ প্রসংগে যৌতুক
● খবির উদ্দীন আহম্মদ

সামাজিক প্রেক্ষাপটে গ্রাম বাংলার নারী শিক্ষার অন্তরায়
● শর্মিষ্ঠা রায়

বাঁকরইলের দুর্গামন্দির
● কাজী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়
● মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আই.বি.এস জার্নাল

আই. বি. এস. জার্নাল

১৪০৪ : ৫

আতফুল হাই শিবলী
নির্বাহী সম্পাদক

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশকঃ
অজিত কুমার চক্রবর্তী
সচিব
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী।
ফোনঃ ৭৫০৭৫৩

© ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ

প্রকাশ কালঃ
চৈত্র ১৪০৪
এপ্রিল ১৯৯৮

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
ডঃ আবু তাহের বাবু

মূল্যঃ টাকা ৫০.০০

মুদ্রণেঃ
সোনালী প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং লিঃ
রাজশাহী। ফোনঃ ৭৬১৮৪২

সম্পাদকমণ্ডলী

নির্বাহী সম্পাদক

প্রফেসর আতফুল হাই শিবলী
পরিচালক, আই.বি.এস. রাঃবিঃ

সদস্য

প্রফেসর এম. আবদুল হামিদ
অর্থনীতি বিভাগ, রাঃ বিঃ

প্রফেসর ফজলুর রশীদ খান
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, রাঃবিঃ

প্রফেসর অভিনয় চন্দ্র সাহা
হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, রাঃ বিঃ

প্রফেসর এম. আবদুল বারী
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাঃ বিঃ

প্রফেসর চৌধুরী জুলফিকার মতিন
বাংলা বিভাগ, রাঃ বিঃ

প্রফেসর আবু দাউদ হাসান
ইংরেজী বিভাগ, রাঃ বিঃ

প্রফেসর প্রীতি কুমার মিত্র
আই. বি. এস. রাঃবিঃ

প্রফেসর এম. জয়নুল আবেদীন
আই. বি. এস. রাঃবিঃ

(প্রবন্ধে উদ্ধৃত তথ্য ও মতামতের জন্য সম্পাদকমণ্ডলী ও আই.বি.এস. এর কোন দায়-দায়িত্ব নাই।)

যোগাযোগের ঠিকানাঃ

নির্বাহী সম্পাদক
আই.বি.এস. জার্নাল
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

শিশুসাহিত্য

কবিতা

কবিতা

কবিতা

###

সূচীপত্র

বাংলাদেশে দর্শন চর্চা ৭
সোলায়মান আলী সরকার

উস্‌কুনীঃ নজরুলের অসংকলিত রচনা ২৩
প্রীতি কুমার মিত্র

বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণঃ ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব ২৫
মলয় কুমার ভৌমিক

রাজশাহী চিনিকল লিমিটেড–এর চিনি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ ৪৯
মোঃ শামসউদ্দীন

বিবাহ প্রসংগে যৌতুক ৬৩
খবির উদ্দীন আহম্মদ

সামাজিক প্রেক্ষাপটে গ্রাম বাংলার নারী শিক্ষার অন্তরায় ৭৭
শর্মিষ্ঠা রায়

বাঁকরইলের দুর্গামন্দির ৮৭
কাজী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ও বাংলাদেশের অভ্যুদয় ৯৩
মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম

চিত্রসূচি

বাংলাদেশে দর্শন চর্চা

সোলায়মান আলী সরকার*

জীবন ও দর্শন শব্দ সবার কাছে পরিচিত হলেও এর সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য সকলে জানে না। আত্মাহীন দেহের মূল্যহীন হওয়ার মত দর্শন বিহীন জীবনের কোন মূল্য নেই। দর্শন হলো সামগ্রিকভাবে মানব জীবন ও বিশ্ব সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি। জীবন দর্শনাশ্রয় হলে জীবনের সজীবতা, সচলতা, প্রানময়তা, ব্যক্তি জীবনের মত সমাজ, জাতীয় ও আন্তরাষ্ট্রীয় দর্শনের গতিময়তা সত্য, জীবনের নানারূপ বিবর্তন সত্য। দর্শন এমন এক অখন্ড দৃষ্টিভঙ্গি যা জীবনকে বিবর্তনের পথে গতিময় করে। জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত ধনী, দরিদ্র, শ্রমিক, মেহনতী জীবন সকল স্তরে সকল অবস্থায় এর প্রয়োজন হয়। সব কিছুর সাথে দর্শন জড়িত। যা আছে ও মানুষ যা জানে তা যেমন দর্শন, যে সব দেখা যায় না, অদৃশ্য, অতীন্দ্রিয়, আধ্যাত্মিক, পরমার্থিক তত্ত্ব মানুষ যা ইন্দ্রিয় অনুভুতির সাহায্যে জানতে পারে না তা দর্শন। হেরাক্লিটাস প্রমুখের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিবর্তন তত্ত্ব, হার্বাট স্পেন্সার, হিউম, কান্ট প্রমুখ দার্শনিকদের অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় তত্ত্ব মানুষের কাছে অনেক বড় দর্শন। আধ্যাত্মিক আত্মা আছে উক্তি যেমন দর্শনের বিষয়বস্তু তেমনি চিন্তা, ইচ্ছা মানসিক প্রবৃত্তি সমূহের সমষ্ঠিই মন বা আত্মা তা দর্শনের বিষয়বস্তু। দর্শন সম্বন্ধে সুধী মহলে কিছু ভুল ধারণা বিদ্যমান। দর্শন কেবল ভাববাদী আধ্যাত্ম ও বিমূর্ত তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে ও ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে যোগ নেই মনে করা হয়। জগতের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য এবং জীবনের নানা সম্ভাবনাকে যারা স্বাধীনভাবে তুলনা ও পরীক্ষা করে দেখেন কোন কিছুকে নির্বিচারে মেনে নেন না তারাই দার্শনিক। জীবনের বিভিন্ন দিক তলিয়ে দেখা, পরীক্ষা নিরীক্ষা ও সমীক্ষা করার মানসিকতাই দর্শন।

অতি প্রাচীনকালে থেলিস থেকে দর্শন তথা বস্তবাদী চিন্তার সূত্রপাত হয়ে হেরাক্লিটাস, এলীয় চিন্তাবিদদ্বয়, এপিকিউরাস, সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল প্রমুখের মাধ্যমে তা বেড়ে উঠে। হিন্দু

---

* প্রফেসর ও সভাপতি, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ভারতীয় দর্শন প্রধানত বৈদিক দর্শন, ষড় দর্শন, মহর্ষি কপিলের পুরুষ প্রকৃতিবাদী দ্বৈত দর্শন, মহর্ষি পাতঞ্জলীর আস্তিক যোগ দর্শন, ঋষি কণাদের বহুত্ববাদী বৈশেষিক দর্শন, মহর্ষি জৈমিনির মীমাংসা দর্শন, মহর্ষি গৌতমের ন্যায় দর্শন, লোকায়ত ও চার্বাক দর্শন, নাথ যোগ দর্শন, শাক্ত শৈব কর্তাভজা দর্শন, নৈরাত্মবাদী –নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধ দর্শন, আত্মাবাদী জৈন দর্শন, মুসলিম দর্শন, বাংলাদেশ দর্শন প্রভৃতি শাখায় বিভক্ত হয়ে আলোচিত হয়।

মুসলিম দর্শন একেশ্বর ভাববাদী, কোরআন–হাদীস, গ্রীক দর্শন, প্রকৃতিবাদী দর্শন, প্লেটোর ভাববাদী দর্শন, নব্য প্লেটোবাদী মরমী দর্শনের আলোকে গড়ে উঠে। ভাববাদী হলেও এ দর্শনে বস্তবাদী দর্শনের সূক্ষ্ম প্রভাব বর্তমান। মুতাজিলা ও আশারীয়া সম্প্রদায়ের দর্শনের তুলনামূলক আলোচনায় আল্লাহর সত্তাসার, গুণাবলী, সৃষ্টিতত্ত্ব, পরমাণুতত্ত্ব, পরকালের সুখ–দুঃখ, শেষ বিচার, ভাল–মন্দ, কল্যান–অকল্যান, উচিৎ–অনুচিৎ তত্ত্ব, বুদ্ধি প্রজ্ঞা, প্রত্যাদেশ প্রভৃতি সমস্যা বিশদ আলোচনা করলে দেখা যায় মুসলিম দর্শনে কার্ল মার্কসের মত সম্পূর্ণ বস্তবাদী দর্শন না হয়েও বস্তবাদী ধারা, বিবর্তন, দ্বন্দ্বতত্ত্ব, পরিবর্তন, উন্নতি, শ্রেণী সংঘাত বিদ্যমান।

আশারীয়দের মতে জগত সৃষ্টি বলে উল্লেখিত হলেও পরমানুতত্ত্বে আশারীয় পরমানুবিদগন মনে করেন জগত অসংখ্য পরিবর্তনশীল জড় পরমানু দ্বারা গঠিত। আশারীয়দের পরমানুবাদ গ্রীক বস্তবাদী ডেমোক্রিটাস ও এপিকিউরাসের পরমানুবাদী দর্শন থেকে স্বতন্ত্র। গ্রীক দার্শনিকগণ জড় পরমানুতে কোন কার্যকারণ ছাড়া বস্তুর মূলে গতিশীল পরমানুর কথা বলেন। আশারীয়দের মতে আল্লাহ তাঁর সৃজনীশক্তি দ্বারা নিয়ত অসংখ্য পরমাণু সৃষ্টি ও ধ্বংস করেন। সে সৃষ্টির শেষ নেই, জগৎ পরিবর্তনশীল ও ধ্বংশশীল। পরমাণুতত্ত্বের প্রতিফলন আর বাকীল্লানীর দর্শনে দেখা যায় যা এরিষ্টটলের অনুসারী আল কিন্দি, আল ফারাবী, আল বেরুনী, ইবনে সিনা, ও ইবনে রুশদের দর্শনে আরো অধিক স্পষ্ট ও পরিস্ফুটভাবে প্রকাশ পায়। এরিষ্টটল যেখানে বস্তুর আকারকে তার বস্তু হিসেবে চিহ্নিত করেন, ইবনে রুশদ বস্তুকে সার ও সুপ্তভাবে বিরাজমান সত্তা বলেন।

ঈসা, মুসা, নানক, কবির, কৃষ্ণ, মুহম্মদ (দঃ) সহ অসংখ্য ধর্ম প্রবর্তক মহাপুরুষ, ঋষি, সন্ন্যাসী, বাবা, মনীষী, দরবেশ, সুফী, আউলিয়া, সাধক এক পরম সত্তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে ধন্য হন। দার্শনিক, ধর্মতত্ত্ববিদ, মৌলভী, মাওলানা, পীর, মাশায়েখ, ফকীর, দরবেশ, সাধক ছাড়াও বেশ কিছু সংখ্যক পদার্থবিদ, রসায়নবিদ, চিকিৎসাবিদ, জ্যোতিবিজ্ঞানী, জীবতত্ত্ববিদ, মনস্তত্ত্ববিদ, উদ্ভিদবিদ ও নৃতত্ত্ববিদ, জীব ও জীবনের ঐক্য ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে এক পরম সত্তা, আত্মা, বেহেশত, দোজখ, সুখ, শান্তি ইত্যাদির কথা স্বীকার করেন ও নৈতিক মূল্যবোধের কথা স্বীকার করে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য বলেন। এই

শিক্ষা কেবল একত্ববাদী ঐশী ধর্ম ও ভাববাদী দর্শনের বিষয়বস্তু নয় অভিজ্ঞতালব্ধ জীবন দর্শনেরও বিষয়বস্তু।

প্রাচীনকালে উত্তরে হিমালয় থেকে শুরু করে দক্ষিনে আরাকানের পশ্চিমাঞ্চল, বঙ্গোপসাগর, উত্তরে আসাম থেকে শুরু করে পশ্চিমে ভাগিরথী নদী পর্যন্ত ভূভাগ অঞ্চল বঙ্গ, গৌড়, পুন্ড্রবর্ধন, রাঢ়, সমতট প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত অঞ্চল, বঙ্গভূমি, নামে পরিচিত ছিল। সপ্তম শতকে রাজা শশাঙ্কের শাসনামলে বিচ্ছিন্ন জনপদ একত্রিত হয়ে বঙ্গদেশ গড়ে উঠে। পরবর্তীকালে গৌড় ও গুপ্ত জনপথ মিলে বৃহৎ বঙ্গদেশ গঠিত হয়, ত্রয়োদশ শতকে মুসলিম শাসকগন ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার হতে শুরু করে মোগল মুসলিম শাসকগন বর্তমান খর্বাকৃতি বঙ্গদেশ তৈরী করেন। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক সৃষ্ট হয় বাংলাদেশ যা উপমহাদেশের পশ্চিমে ভারত অন্তর্ভুক্ত পশ্চিমবাংলা ও ভারতের মুল ভূখন্ড, উত্তরে মেঘালয় ও আসাম প্রদেশ, পূর্বে আসাম প্রদেশ ও পূর্ব দক্ষিন কোণে বার্মা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। বাংলাদেশে বিভিন্ন জাতির অনার্য কোল, দ্রাবিড়, অষ্ট্রেলীয়, মঙ্গোলীয়, আলপাইনীয়, আরবের সেমীয়, আফ্রিকার হাবসি, ইউরোপীয় নানা জাতির বনিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জনগণের রক্ত সংমিশ্রনে বর্ণ সংকর বাঙালী জাতি গড়ে উঠে যাদের প্রত্যেকের আলাদা ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা, দর্শন, শিল্পকলা ইত্যাদি রয়েছে। বহু শাসকের শোষণ শাসন চলার পরে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলন ইত্যাদি করে দেশ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের আবির্ভাব ঘটে। ১৯২১ সালে ভারত ও বাংলাদেশে ভাববাদী, আধ্যাত্মবাদী ইত্যাদি দর্শনসহ মার্কসবাদী সাহিত্য ও দর্শন চর্চা শুরু হয়ে ১৯৫৭ সালে মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষানী, শেখ মজিবর রহমান, আহমদ শরীফ, সিরাজুল ইসলাম, সাইদুর রহমান, সালাহ উদ্দীন, আবুল হুসেন, নজরুল ইসলাম, রাশেদ খান মেনন, বদর উদ্দীন প্রমুখের নেতৃত্বে পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি, যুবলীগ, ভাসানী ন্যাপ, পূর্ববাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি, পূর্ব বাংলার লেখক সংঘ, বাংলাদেশে বিপ্লবী কমিউনিষ্ট পার্টি, পূর্ব বাংলার সাম্যবাদী দল, পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি, ওয়ার্কার্স পার্টি ইত্যাদি দলের সাথে মার্কসবাদী দর্শনের আলোচনা চলে এক সময় মার্কসবাদ, মাওসেতুংবাদ চালু হয়।

'দর্শন সমিতির বারো বছর' পত্রিকা হতে জানা যায় 'পাকিস্তান ফিলোসফিক্যাল কংগ্রেস' এর সভাপতি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ডঃ মমতাজ উদ্দিন আহমদ একাত্তরে মারা যান এবং ফিলোসফিক্যাল কংগ্রেসের অন্যতম সম্পাদক পূর্ব পাকিস্তান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের তৎকালীন প্রধান ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেব একাত্তরের ২৫শে মার্চ রাতে নির্মমভাবে নিহত হন। ১৯৭৩ সালে সমিতির সভাপতি প্রয়াত অধ্যক্ষ সাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে এক সভায় সৈয়দ আব্দুর রাজ্জাক খসড়া সংবিধান পেশ করলে সামান্য রদবদলের

পর তা গৃহীত হয়। গৃহীত সংবিধানে বাংলাদেশ দর্শন সমিতির আদর্শ ও লক্ষ্য নিম্নরূপভাবে বর্ণনা করা হয়ঃ

(১) জ্ঞানই দর্শন। জ্ঞানের সার্বিক চর্চা এবং তার ক্রমোন্নতি সাধনের প্রয়াস। (২) দর্শন চর্চা সম্পর্কে জনমনে বিদ্যমান বিভ্রান্তির দূর করার উদ্দেশ্যে দর্শনের নব মূল্যায়নের ভিত্তিতে দেশব্যাপী দর্শনের পঠন পাঠন ও প্রকাশকে জনপ্রিয় করে জাতীয় জীবন দর্শনকে দৃঢ়মূল করার প্রয়াস সমিতির লক্ষ্য। (৩) মাতৃভাষাকে জ্ঞান অর্জনের মৌলিক বাহন হিসেবে বিবেচনা করে, সমিতি বাংলার মাধ্যমে দর্শন পঠন পাঠন ও প্রকাশের সক্রিয় প্রয়াস গ্রহন করবে। নিয়মিতভাবে সমিতির মূখপত্র 'দর্শন' প্রকাশ, বার্ষিক সম্মেলন ও সভা সেমিনার ইত্যাদি আয়োজন করবে।

১৯৭৫ সালের বার্ষিক কার্যবিবরণী হতে জানা যায় 'মার্কসবাদী দার্শনিক আহমদ শরীফ, প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখের অনুসরণে বাস্তববাদী চিন্তাবিদ অধ্যাপক হাসান আজিজুল হক ১৯৭৫ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আতিথিয়েতায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ দর্শন সমিতির দ্বিতীয় সাধারণ সম্মেলনের 'বাংলাদেশ দর্শন' শাখার সভাপতির ভাষনে নৈরাশ্যজনক উক্তি করে বলেন বাংলাদেশে বিশেষ কোন দর্শন নেই অর্থাৎ পারিভাষিক অর্থতে যাকে দর্শন বলা চলে। বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় লিখিত দর্শনের অস্তিত্ব নেই যেমন আছে জার্মান দর্শন, ইংরেজী বা ফরাসী দর্শনের। আধ্যাত্ম চেতনা বাঙালীর দর্শনের মূল লক্ষ্য। সে দিক থেকে সহজিয়াবাদ, মরমিয়া দর্শন, বাউল দেহাত্মবাদ, বৈষ্ণব দর্শন, ভক্তিবাদ, সুফীমত ইত্যাদি সবই বাঙালীর দর্শন। আধ্যাত্মিকতা শুধু বাঙালীর চিন্তার নয়, সমস্ত ভারতীয় দর্শন, বৈদিক, উপনিষদিক ষড়দর্শন, নাস্তিক বৌদ্ধ জৈন দর্শনের বৈশিষ্ট্য, সমস্যা এই জগৎ নিয়ে নয়, সমস্যা আত্মা নিয়ে, আত্মার মুক্তি নিয়ে। দর্শনের যাবতীয় কুট প্রশ্ন সৎ-অসৎ এবং মোক্ষ ও নির্বানকে কেন্দ্র করে, আরোপ্যাতীত আধ্যাত্মিকতা নিয়ে আলোচনা করে। দার্শনিকরা সম্পূর্ণ খোলা চোখে অভিজ্ঞতা প্রদত্ত পৃথিবীর সম্মুখীন হন না ভালবাসেন না জীবন, কর্ম সংগ্রাম, মানব সমাজের কথা ভাবেন না, ব্যক্তির মুক্তি আর পারত্রিক স্বার্থ অর্জনের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। তাঁকে কমরেড মোজাফফর হোসেন, মানবেন্দ্র রায়, অধ্যক্ষ সাইদুর রহমান প্রমুখকে অনুসরণ করে মার্কসবাদী দার্শনিক প্রফেসর মফিজ উদ্দীন আহমদ ১৯৭৫ সালে সভাপতির অভিভাষন 'বাঙালীর ঐতিহ্য ও সমকাল' এ বলেন 'বাঙালীর দর্শন চিন্তায় শুদ্ধ জ্ঞান চর্চার ঐতিহ্য বিশেষ পরিপুষ্ট নয়। এ কথা সমগ্র ভারতীয় দর্শন সম্পর্কেও প্রযোজ্য। এ দেশে দর্শন চিন্তা মূলত মুক্তি বা মোক্ষলাভের কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। মোক্ষলাভকে উদ্দেশ্য হিসেবে সামনে রেখেই দার্শনিক চিন্তার উদ্ভব, বিকাশ ও পরিনতি লাভ ঘটেছে। শুদ্ধ তত্ত্বচিন্তা গ্রহণ করেছে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।' ১৯৭৭ সালে সৈয়দ কামরুদ্দীন হোসেইন তাঁর 'বাংলাদেশ দর্শন চর্চার ঐতিহ্য', ১৯৭৯ সালে সোলায়মান আলী সরকার তাঁর 'বাংলাদেশ দর্শনের বৈশিষ্ট্য 'প্রমুখের প্রবন্ধ সমূহ প্রকাশিত হয়

যেখানে দেখানো হয় প্রখ্যাত ইউরোপীয় নৃতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক, দার্শনিক পন্ডিত স্যার জন মার্শাল, ম্যাকমুলার, ওয়েবার, স্যার উইলিয়াম জোনস্ রিস ড্যাভিডস, স্কচ দার্শনিক ডুগাল্ড ষ্টুয়ার্ট, ফুলার, ডঃ নিকোলসন, ভারতীয় দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু, ঐতিহাসিক কালিদাস নাগ, ডঃ তারাচাঁদ, প্রমোদলাল পাল, সুসাহিত্যিক ডঃ তমোনাশ চন্দ্র দাসগুপ্ত, ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ জাহানারা হোসেন, দার্শনিক ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেব, এ. এইচ. দানী, ডঃ আব্দুল করীম, ডঃ আজীজ আহমেদ, ডঃ আব্দুর রহীম, ডঃ মমতাজুর রহমান তরফদার, গোলাম মঈন উদ্দীন, ডঃ সালাহ উদ্দীন আহমদ, ডঃ আব্দুর রহিম জোয়ারদার প্রমুখের গ্রন্ধাবলী হতে সাহিত্য ও সংস্কৃতি, সমাজ নৃতত্ত্ব, উদ্ভাবনী শক্তি, বিচক্ষণ, মস্তিষ্কবান, ভারত, চীন প্রভৃতি দেশ জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে গ্রীস অপেক্ষা যথেষ্ট অগ্রগামী ছিল। বাংলাদেশের প্রাচীন অধিবাসী অনার্য দ্রাবিড়রা সে সব দেশের জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত মনীষীদের বংশধর। প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে ভারত ও বাংলাদেশের সাথে মিশর, আসিরিয়া, সুমেরিয়া, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশের সম্পর্ক স্থাপিত হয় আর বাংলার অনার্য আদিম অধিবাসীদের সুচিন্তার প্রাচীন নিদর্শন রাজশাহী জেলার সোমপুর, পাহাড়পুর লক্ষ্মনাবতী, গৌড়, পান্ডুয়া, বগুড়া জেলার পুন্ড্রবর্ধন, রামাবতী, রংপুর, কুমিল্লা জেলার ময়নামতী, চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন অঞ্চল সহ বহু স্থান প্রাচীন চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্য, সংস্কৃতি সাধনা, ন্যায় শাস্ত্র, সহজিয়া সাধনা, দীর্ঘ জীবন লাভের সাধনা ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ ছিল আর বাংলার অনার্য জনগন সুশিক্ষিত ছিল। মহামতি গোখলে বলেন, উদ্ভাবনী শক্তি, নতুন কর্মক্ষমতা ইত্যাদি লক্ষ্য করে বলা হয় বাঙালী ভারতের মস্তিষ্ক, সে আজ যা ভাবে সমগ্র ভারত আগামীকাল তা চিন্তা করে। সুফী সাহিত্য বিশারদ ডঃ এ. আর. নিকোলসন সুফীবাদ সম্পর্কে তাঁর অল্প জ্ঞান থাকা অবস্থায় সর্বেশ্বরবাদ বলে ভ্রান্তভাবে আখ্যায়িত করে পরে পূর্ন জ্ঞান লাভ হলে সঠিকভাবে বলেন যে মতবাদের মধ্যে প্রার্থনা, মোনাজাত ইত্যাদি আছে, ঈশ্বরের ধারণা সর্বেশ্বরবাদী হলেও সে ঈশ্বর অতীন্দ্রিয় ঈশ্বর। ১৯৮৪ সালে ডঃ মফিজ উদ্দীন আহমদ জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্ষিক সম্মেলনে একজন সুপন্ডিতের মত বলেন 'বাংলাদেশের দার্শনিক ঐতিহ্য অত্যন্ত গৌরবময় এবং এর স্বকীয়তা সম্পর্কে কোন অস্পষ্টতা দ্বিধা বা দ্বন্দ্বের অবকাশ নাই।"

বাংলাদেশের মানুষের সুদীর্ঘ সংগ্রামের ঐতিহ্যের মতো দর্শন চিন্তার ঐতিহ্য রয়েছে। বাঙালীর দর্শন ও বাংলাদেশে দর্শন অভিন্ন নয়। বাঙালীর দর্শনকে বাংলাদেশে বিকশিত দর্শনের ঐতিহ্য হিসেবে বিবেচনা অনিবার্য হলেও বাংলাদেশে দর্শনের রয়েছে এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। ইউরোপীয় পন্ডিত স্যার ইউলিস জোনস এর মতে দর্শন সমাজ চেতনার প্রাচীনতম রূপের অন্যতম চিন্তা। ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেবের মতে মানুষের ইতিহাস যে দিন থেকে শুরু সে দিন থেকে তার দার্শনিক চিন্তার শুরু। ডঃ আমিনুল ইসলামের মতে মানুষের বাহ্যিক দৈনন্দিন জীবন ও আভ্যন্তরীন

জীবনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য তত্ত্বজিজ্ঞাসার উৎপত্তি। শূন্য থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কখনো কোনো দার্শনিক মতের উদ্ভব হয় না বা হয়নি, পরিবেশ, পরিস্থিতি ও সমস্যার মোকাবেলা করতে গিয়ে এমন হয়। জগত ও জীবনের নানা প্রকার সমাধান কল্পে দার্শনিক যে অভিমত ব্যক্ত করেন তা এক দিকে যেমন প্রভাবিত হয় তার শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতার দ্বারা, অন্যদিকে তাতে প্রতিফলিত হয় সমকালীন সামাজিক, ধর্মীয়, নৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক সমস্যা। দার্শনিক তাঁর সমসাময়িক কাল, পরিবেশ ও তার সমস্যা সমূহকে আলোচনার বিষয় বস্তু হিসেবে গ্রহন করেন এবং সমকালীন দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি অবস্থাকে চিত্রিত করার প্রয়াস পান। ডঃ সোলায়মান আলী সরকার তাঁর ইউরোপীয় প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ, স্যার জন মার্শাল, ঐতিহাসিক, দার্শনিক পন্ডিত ম্যাকমুলার, ওয়েবার, স্যার ইউলিয়াম জোনস, রিস ড্যাভিডস, স্কচ দার্শনিক ডুগাল্ড স্টুয়ার্ট ফুলার, কুঁজে, গমপার্জ, জিমারম্যান, উইল ডুরান্ট, জেলার, ফুলার, ডঃ নিকোলসন প্রমুখ, ভারতীয় দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু, সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রমোদলাল পাল, ডঃ কালিদাস নাগ, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, হীরালাল হালদার, কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য, হরিদাস ভট্টাচার্য, অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, মহামতি গোখলে, ক্ষিতিমোহন সেন, সুকুমার সেন,শশীভূষণ দাসগুপ্ত, কে.এন. দীক্ষিত, ডঃ নীহার রঞ্জন রায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, নলিনী দাসগুপ্ত, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টচার্য, সুরজিৎ দাসগুপ্ত, মাধব আচার্য, দীনেশ চন্দ্র সেন, এম. এম. শরীফ, আল্লামা ডঃ ইকবাল প্রমুখ, সৈয়দ আলী আহসান, সৈয়দ আলী আশরাফ, ডঃ মাহমুদ শাহ কোরেশী, ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ এনামুল হক, ডঃ শাহনারা হোসেন, এ. এইচ. দানী, ডঃ আব্দুল করিম, ডঃ আজীজ আহমেদ, ডঃ আব্দুর রহিম, গোলাম মঈন উদ্দীন, সালাহ উদ্দীন আহমদ, ডঃ আবদুর রহিম জোয়ারদার, ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেব প্রমুখের নানা গ্রন্থাবলী হতে উক্তি উদ্ধৃত করে প্রমাণ করেন যে অতি প্রাচীন কাল হতে উপমহাদেশে অর্থাৎ ভারত, বাংলাদেশে, চীন, মিশর, আসিরিয়া, ব্যাবিলন, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি দেশ জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার গ্রীস অপেক্ষা যথেষ্ট অগ্রগামী ছিল।প্রখর মস্তিষ্কবান অনার্য বাঙালী নিজের পছন্দ মতো ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিক্ষা তথা জীবনাদর্শ ঠিক করে নেয়। গ্রীক দর্শন, প্রাকৃতিক দর্শন, মরমী দর্শন, দীর্ঘ জীবন লাভের দর্শন, যোগ সাধনা, তন্ত্র, মন্ত্র, উদ্ভাবনী শক্তি, বিচক্ষণ শক্তি নতুন বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনী ক্ষমতা, মধ্যযুগীয় ধর্ম, দর্শন, হিন্দু দর্শন, ইসলামী দর্শন, মুতাযিলা সুফী মানবতাবাদ, সামাজিক ন্যায় বিচার ইত্যাদি আধুনিক ইউরোপীয় অভিজ্ঞতাবাদ, যুক্তিবাদ, বিচারবাদ, স্বজ্ঞাবাদ, প্রয়োগবাদ ইত্যাদি পাশ্চাত্য প্রকৃতিবাদী জড় দর্শন, বাস্তববাদ, যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ, সহজলভ্য অমরত্ব লাভের উপায়, অস্তিত্ববাদ, ভাষা দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, ন্যায়

দর্শন, নব্য দর্শন, সাধনা, দেহ সাধনা, অমরতা লাভের সাধনা, মার্কসবাদ ইত্যাদি পছন্দ মতো পরিবর্তন করে আপন করে নেয় বাঙালী।

আদিম অধিবাসীরা জীবন ধারনের জন্য সকল যুগোপযোগী ধর্ম সহজ উপায়ে দীর্ঘ ও অমরতা লাভে দেহ সাধনা প্রভৃতি চর্চা করেছে। আদিম অধিবাসীরা পর্যবেক্ষন, প্রত্যক্ষণ, নিরীক্ষণ, পরীক্ষণ, ভুল ত্রুটির সংশোধন, বিচার বিশ্লেষণ, উপলব্ধি প্রভৃতির সাহায্যে ধর্ম, সাধনা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সভ্যতা, দর্শন, শিল্পকলা ইত্যাদি সৃষ্টির নিদর্শন সৃষ্টি করেছেন। ডাঃ কালিদাস নাগ, রাধাকৃষ্ণণ, জওহরলাল নেহেরু, ডঃ তারাচাঁদ, ডঃ নিকোলসন প্রমুখ পন্ডিত ব্যক্তিদের মতে প্রাচীন বাংলার অনার্য দ্রাবিড়, কোম প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা, লোকায়ত চিন্তাবিদরা অসভ্য ছিলেন না, তাঁরা প্রধানতঃ কৃষি কর্ম করে, পশু পালন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন, বানিজ্য উপলক্ষে নদ–নদী সাগর উত্তীর্ণ হয়ে আরব, পারস্য, মিশর, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশের সাথে বাণিজ্য উপলক্ষে দূর দেশে যেতেন ও নগরে বসবাস করতেন।

দর্শন উৎপত্তির বহুকাল পূর্ব হতে বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষে জড়বাদী দর্শন, বাস্তববাদী দর্শন, দেহতত্ত্ব সাধনা, যোগ সাধনা ও আধাত্মবাদী ও দর্শন বাস্তববাদী দর্শন, সমাজতন্ত্র, ইসলামী সমাজতন্ত্র প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। অনার্য দ্রাবিড়, কোম ইত্যাদি সম্প্রদায়ের বাঙালীর সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন চর্চা, দেহতত্ত্ব সাধনা ইত্যাদি আলোচনা করলে দেখা যায় আবেগ, বিশ্বাস ভক্তির প্রাবল্যে কেবল আবেগপ্রবণ, ধর্মপ্রবণ, জীবন বিরাগী, পরলোকমুখী ও আধ্যাত্মবাদী ছিলেন না বরং একই সাথে তাদের জীবনবাদী, জীবন জীবিকার স্বাচ্ছন্দ্য প্রয়াসী সুখবাদী দর্শন জীবন যাপন উপযোগী দর্শন ছিল। জীবনবাদী বলে অনার্য বাঙালীর জীবনকাঠি বলে জানতো দেহ তত্ত্ব সাধনা, যোগ তাত্ত্বিক কায়া সাধনা করে দীর্ঘ জীবন ও অমরত্ব লাভের প্রত্যাশা সাংখ্য যোগ তন্ত্র প্রভৃতি নিরীশ্বরবাদী দর্শন চর্চা করতেন। লোকায়তিক বা চার্বাক দার্শনিক সম্প্রদায় বাংলাদেশ ও ভারতে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর বহু পূর্ব হতে তাঁদের দর্শন ও বৈজ্ঞানিক আলোচনা চালু রেখে ছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে জৈন ধর্ম প্রচারক মহাবীর ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারক গৌতম বুদ্ধ বাংলাদেশে অভিজ্ঞতাবাদী, নিরীশ্বরবাদী ও সংশয়বাদী ধর্ম, নৈরাত্মবাদী মতবাদ, সহজিয়া ধর্ম, সাধনা ইত্যাদি প্রচার করেন। এক সময় সমগ্র উত্তর বঙ্গ জৈন ধর্মাবলম্বী বহু মানুষ ছিল, বহু সংখ্যক জৈন বিহার ও মন্দির ছিল। সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত পুন্ড্রবর্ধন জৈনদের একটি প্রধান শিক্ষা কেন্দ্র ছিল। সোমপুর, পাহাড়পুর এর জৈন বিহারগুলো বিহার প্রদেশের নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রসিদ্ধ জৈন ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন, ন্যায় শাস্ত্র ও সাধনা শিক্ষা কেন্দ্র ছিল। নিরীশ্বরবাদী, মানবতাবাদী, সাম্যবাদী, বৌদ্ধধর্ম বাংলাদেশে মহাযান, কাল চক্রযান ও সহজযানে বিবর্তিত হয় ও ইসলামের আবির্ভাব তরান্বিত করে অনুকূল পরিবেশ যোগায়। বৌদ্ধ চর্যায় ও দোহায় বাংলাদেশের মনন

বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। বৌদ্ধ মতের প্রতিবাদ বেদান্ত লালিত বাক্ষণ্যধর্মে জাতিভেদ ব্রাক্ষন, কায়স্থ, বৈশ্য, শুদ্র, শ্রেণী বিভাগ বা অসাম্যের আদর্শ ও জীবন মুখিতার বিরুদ্ধে প্রকাশ পায়। প্রেম, সাম্য, নিয়ম, নিষ্ঠা, মানব কল্যান, নিরীশ্বরবাদ, নৈরাত্মবাদ ন্যায়নীতি ইত্যাদি সমাজ অনুমোদিত অনাচার, ব্যাভিচার সহজিয়া ইত্যাদি ইসলামী একেশ্বরবাদ, প্রেম, সামাজিক ন্যায় বিচার, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সাম্য, মৈত্রী, নতুন জীবন দর্শন প্রভৃতির পথ উন্মোচন করে দেয়। ভারতীয় প্রখ্যাত পন্ডিত শঙ্করাচার্য, রামানুজ, চৈতন্যদেব, অদ্বৈতবাদ, নিত্যানন্দ, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, গোবিন্দ চন্দ্র প্রমুখ হিন্দু ধর্ম, হিন্দু সমাজ ও হিন্দু দর্শন, সমাজ কল্যান সাধনের জন্য হিত সাধনের উদ্দেশ্যে ইসলামকে নিজের পছন্দ মতো রূপ দিয়ে আপন করে নেন, নিজভাবে প্রকাশ করে, পরিবর্তনশীল ইসলাম নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হন। নৈরাত্ম নিরীশ্বরবাদী লোকায়ত চার্বাক ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, ব্রাক্ষন্য ধর্মের জাতিভেদ অস্বীকার করে নীতি ধর্মে রূপান্তর হয়ে নানা সম্প্রদায় মন্ত্রযান, কালচক্রযান, সহজযানে বিকৃতি ও বিবর্তন পায়, বৌদ্ধ চৈত্য হয় অসংখ্য দেব দেবতার আখড়া, ব্রাক্ষন্য ধর্ম স্থানিক দেব দেবতা, চন্ডী, মনসা, লক্ষ্মী, শীতলা এবং উপদেবতা একেশ্বরবাদী ইসলাম ধর্ম বহু পীর, সত্যপীর, পাঁট গাজী, পাঁচ পীর, খিজির পীর, বড়খাঁ, গাজী, কালু, চম্পাবতী প্রভৃতি কাল্পনিক পীরের পুজায় পর্যবসিত হয়। বাঙালী কেবল মাত্র আবেগপ্রবণ, ভাবপ্রবণ, ধর্মপ্রবণ, জীবন বিরাগী পরলোকমুখী, ইহলোক ত্যাগী নয় বরং তীক্ষ্মবুদ্ধি সম্পন্ন, ভোগলিপ্সা, জীবনবাদী, লাল পিপড়ের মত অতিচালক, জীবন জীবিকার স্বাচ্ছন্দ্য প্রয়াসী, যোগ তান্ত্রিক কায়া সাধনকারী, সাংখ্য, যোগ, তন্ত্র, সহজিয়া শাস্ত্র প্রভৃতি নিরীশ্বরবাদী শাস্ত্র অনুসরণকারী প্রবলভাবে বস্তবাদী ও ভোগবাদী চিন্তাবিদ ছিলেন। বাংলার চার্বাক লোকায়ত জড়বাদী বাস্তববাদী, সুখবাদী, ভোগবাদী সময় উপযোগী দর্শন, চৌদ্দ শতকের গৌড় পূর্নানন্দের 'তত্ত্ব মুক্তাবলী মায়াবাদ শতদুষনী' গ্রন্থ শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ খন্ডন আধুনিক বৃটিশ বস্তবাদী ও মূর রাসেল প্রমুখ নব্য বস্তবাদীদের দর্শনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বাঙালী, দার্শনিক ঐতিহ্য যুক্তিবাদী ও বিশ্লেষণবাদী। সুপ্রাচীনকালে এ দেশে সংস্কৃত ভাষায়, প্রফেসর আমিনুল ইসলাম, আহমদ শরীফ প্রমুখ বলেন, শিল্প সাহিত্য, দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা সাধনা প্রভৃতি চর্চার শ্রীধর ভট্ট প্রমুখ সর্ব ভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেন। শ্রীধর ভট্টের ন্যায় কন্দলী, অদ্বয়সিদ্ধি, তত্ত্ববোধ, তত্ত্বসংবাদিনী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য বাঙালী দার্শনিকদের গ্রন্থাবলী। সুপ্রাচীনকালে উপমহাদেশে নয়টি দার্শনিক সম্প্রদায় চার্বাক বা লোকায়তিক, জৈন, বৌদ্ধ, সাংখ্য, ন্যায়, মীমাংসা, বৈশেষিক ও বেদান্ত দর্শন চর্চা করা হতো। ইসলামের আবির্ভাবে দক্ষিন ভারতে শঙ্করাচার্য, রামানুজ, মাধব প্রমুখ উত্তর ভারতে নানক, কবীর প্রমুখ, বাংলা ভারতে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয় কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র,

বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, গোবিন্দ চন্দ্র দেব প্রমুখ জন্মে ভারতের ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা, দর্শন পরিবর্তিত হয়ে হিন্দু দর্শন বলতে যা বোঝায় তা তাদের লেখনীতে গ্রীক দর্শন, আধুনিক দর্শন, আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন সহ সুখবাদ, হিতবাদ, মানব কল্যান, প্রয়োগবাদ, অস্তিত্ববাদ, মার্কসবাদ, মাওসেতুং বাদ ইত্যাদি দর্শনের আলোকে গড়ে ওঠে, নানারূপ কল্যানধর্মী হয়ে প্রকাশ পায়, প্রাচ্যে পাশ্চাত্য দর্শনের ধারাবাহিকতার ভিত্তিতে বিচার করলে তা বোঝা যায়। চার্বাকদের জড়বাদ চার উপাদানবাদ, গৌড় পুর্নানন্দের মায়াবাদ খন্ডন প্রমুখের যুক্তিবিদ্যা, ন্যায় তত্ত্ব দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা, সুদীর্ঘ জীবন লাভকারী সাধনা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে সুপ্রাচীনকাল হতে চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, ন্যায়, মীমাংসা, বেদান্ত, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ দর্শনের ওপর অসংখ্য টীকা ভাষ্য, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব দর্শন, ইসলামী দর্শন, সুফী মানবতাবাদী সমাজ কল্যানবাদী মতবাদ, যুক্তিবাদী মুতাজিলা দর্শন, পাশ্চাত্য দর্শন, মার্কসীয় দর্শন, জাপানী দর্শন, চীনা দর্শন প্রভৃতি বাঙালী দর্শন চিন্তার সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। সাংখ্য, যোগতন্ত্র ইত্যাদি বাঙালীর আদি নিরীশ্বররবাদী, টোটেমবাদী, বহু দেবতাবাদী, নৈরাত্মবাদী, নাস্তিকবাদী দর্শন যা উপনিষদের প্রভাবে ক্রমশঃ একেশ্বরবাদী, আস্তিকবাদী, আত্মাবাদী, মানবতাবাদী, হিতবাদী, সমাজ কল্যাণবাদী হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশের দার্শনিক আমিনুল ইসলাম, অধ্যাপক শরীফ হারুন, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ প্রমুখ বলেন ইংরেজ আগমনের পূর্বে যারা বাংলাদেশে দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, সাধনা শাস্ত্র প্রভৃতি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন তাঁরা সপ্তম শতকের মীমাংসা দর্শনের ভাষ্যকার শালিক নাথ ভবদেব ভট্ট, হলায়ুধ, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, রঘুনাথ বিদ্যালংকার, চন্দ্রশেখর বাচস্পতি প্রমুখ বেদান্ত দর্শনের ভাষ্যকার গৌড়পাদ, শ্রীধর ভট্টাচার্য, বিজ্ঞান ভিক্ষু মধুসূদন স্বরস্বতী, বাসুদের সার্বভৌম, গৌড় ব্রক্ষানন্দ, গৌড় পূর্নানন্দ, গোবিন্দনন্দ, রাম নাথ বিদ্যা বাচস্পতি, রাধারামন দাস গোস্বামী, রাখালদাস, ন্যায়রত্ন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। আব্দুল মতিন, সোলায়মান আলী সরকার, আমিনুল ইসলাম প্রমুখ বলেন, বাঙালীর দর্শন চর্চা করা হতো যুক্তিবিদ্যা বিচার বিশ্লেষনের আলোকে। গৌড়ীয় নৈয়ায়িকেরা, নবদ্বীপের নব্য নৈয়ায়িকরা নব্য ন্যায়ের চর্চা করতেন যা পনের শতক হতে আঠার শতক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। পনেরো শতকের হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য, ষোল শতকের রঘুনাথ শিরোমনি, কণাদ তর্কবাগীস, হরিনাম তর্কবাগীস, সতেরো শতকের জগাদীশ তর্কালঙ্কার, গদাধর ভট্টচার্য, ঈশান ন্যায়চার্য, জানকীনাথ ভট্টাচার্য চুড়ামনি, কৃষ্ণদাস সার্বভৌম, রামভদ্র সার্বভৌম, জগদপুরু শ্রীরাম তর্কালঙ্কার, ভবানন্দ সিদ্ধান্ত বাগীস, মথুরনাথ তর্কবাগীস, গদাধর ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী, গুনানন্দ বিদ্যাসাগর প্রগলভাচার্য, বলভদ্রমিত্র, রুদ্রনায় বাচস্পতি, বিশ্বনাথ সিদ্ধান্ত পঞ্চানন, গৌরিনাথ সার্বভৌম, নরসিংহ পঞ্চানন, জয়রাম, হরিনাম তর্কবাগীস প্রমুখ

নব্যন্যায়পন্থী প্রখ্যাত বাঙালী, নৈয়ায়িক বা যুক্তিবিদ ছিলেন। শিক্ষা দীক্ষা দীর্ঘ জীবন লাভকারী যোগশাস্ত্র সাধনা দেহ সাধনা, তত্ত্ব আলোচনা সহ চর্চিত হতো যুক্তিবাদী শাস্ত্র।

বিশ্লেষনবাদী ও ভাববাদী দার্শনিক আমিনুল ইসলাম বলেন সাংখ্যযোগ দর্শনের ভাষ্যকার স্বপ্নেশ্বর আচার্য, রামানন্দ, অনিরুদ্ধ, গঙ্গাধর কবিরাজ, পঞ্চানন তর্করত্ন প্রখ্যাত ন্যায় তার্কিক ও দার্শনিক। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে মধ্য যুগে চৈতন্য দেব, ভাগবত চৈতন্যদেব, ভাগবত চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ ও শত বৈষ্ণব পদাবলীর মাধ্যমে গ্রীক দার্শনিক প্লেটোগোরাসের মানব প্রীতি, জ্ঞান ও মানবতার মতো বাংলাদেশে যে ভাব, প্রেম ভক্তির বিরাট প্লাবন আনেন তাতে বহু মুসলমান কবি, লেখক, ভাবুক, সুফী, দরবেশ, কুতুব, আউলিয়া, সাধকরা ভেসে যায়। ডঃ এনামুল হক, ডঃ আহমদ শরীফ, আব্দুল করিম প্রমুখ বলেন, কবি শেখ জাহিদ, ফয়জুল্লাহ, হাজী মুহাম্মদ, সৈয়দ সুলতান, শেখ চাঁন্দ, আলী রাজা, হাসান রাজা, লালন শাহ, দুধ মল্লিক শাহ, শিতলাং শাহ, খোন্দকার রফি উদ্দীন, খোন্দকার রিয়াজুল হক প্রমুখ অমূল্য অবদান রেখে জ্ঞান, প্রেম, ভাব, ভক্তি, মানবতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, হিন্দু মুসলমানের মিলনের ক্ষেত্রে কাজ করেন। ১৯৭৪ সাথে বাংলাদেশ দর্শন সমিতির প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে বাস্তববাদী ও সংশয়বাদী চিন্তাবিদ প্রফেসর আহমদ শরীফ ও ১৯৯১-৯২ সালে 'দেব স্মারক' বক্তৃতায় প্রফেসর রমেন্দ্রনাথ ঘোষ একজন বাস্তববাদী, অভিজ্ঞতাবাদী ও সংশয়বাদী চিন্তাবিদ বলেন, বৌদ্ধ দর্শনে শীল ভদ্র,শান্ত রক্ষিত, কমলশীল, দিবাকর চন্দ্র, শান্তিদেব, কুমার বজ্র, প্রজ্ঞা বর্মন, তেজারী, অতীশ দীপঙ্কর, জ্ঞানশ্রী মিশ্র, বিভূতি চন্দ্র, রত্নাকর শান্তি, অভয়াকর গুপ্ত, কুমার চন্দ্র, বোধিভদ্র, বাগবোধি, শুভাকর মৎসেন্দ্রনাথ, কুল লক্ষণ, মীননাথ, গোরক্ষনাথ শীলভদ্র, অম্বরনাথ, হাড়িপা, কানুপা প্রমুখ বাংলার স্মরনীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এদের দেশ তত্ত্ববাদী বাঙালী যোগতান্ত্রিক সাধনা, যাদু, মন্ত্র, কবজ, মাদুলী, মারন বশীকরন প্রভৃতির অনুশীলন ও প্রয়োগ, মনন ও জড়বাদী আপেক্ষিক দেহ সাধনা ক্ষেত্রে বা আধ্যাত্মক্ষেত্রে গৌরব ও গর্বের বিষয় ছিল। প্রাচীনকালের বাঙালীর মনন, বাস্তব জীবন দৃষ্টি, ঐহ্যিক ও পারত্রিক সুখলোভী আস্তিক মানুষের আত্মা প্রীতি প্রবল চাহিদা মিটায়। প্রফেসর আহমদ শরীফ প্রমুখ সাহিত্যিক সত্যিকার ভাবে বলেন, আজীবিক, কপিল ও চার্বাক শিষ্য নাস্তিক নৈরাত্ম ও নিরীশ্বরবাদ প্রসূত উচ্চ দার্শনিক চিন্তা, নির্বাণবাদ শূণ্য ও বজ্রতত্ত্ব, গুনরত্ম শিষ্যদের লোকায়তিক জড়বাদী ও বাস্তববাদী দর্শন, ভোটচীনা প্রভাবে যোগতান্ত্রিক পঞ্চ তাত্ত্বিক, দেহ তাত্ত্বিক সাধনা প্রাধান্য পায়। এমন কি চৈতন্য, অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্ব, গৌড়ীয় ন্যায়, নব্যন্যায়, দেহ সাধনা প্রভৃতি বাঙালী চিন্তাবিদদের অক্ষয় কীর্তি।

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে রাসেল কবি ওয়ার্ডস ওয়ার্থ, শেলী, কীটস, বায়রন প্রমুখের মতবাদকে দর্শনের অন্তর্ভূক্ত করেন। সত্য লাভের প্রচেষ্টা হিসেবে বাংলাদেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের ধ্যানধারনাকে দর্শনের তত্ত্ব হিসেবে গ্রহণ করা যায়। উপমহাদেশের দর্শনকে সর্ব প্রথম

ম্যাকস মুলার পাশ্চাত্য জগতে প্রচার করেন। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রমুখ বিশ্বখ্যাতি সম্পন্ন চিন্তাবিদরা ভারতীয় দর্শন বিস্তারিতভাবে আলোচনা ও সমালোচনা করে এ বিশ্বে ষড় দর্শনকে শ্রদ্ধার বিষয়বস্তু বলে প্রতিষ্ঠিত করেন। উপমহাদেশে বিশেষভাবে বাংলাদেশে অনেক কবি, দার্শনিক, চিন্তাবিদ রয়েছেন যারা উচ্চাঙ্গের চিন্তা, তত্ত্বজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদির পরিচয় দেন। সুফী, নব্যসুফী, আউলিয়া, দরবেশ, ফকীর, সাঁই, বাউল, সাধু, সন্ন্যাসী, ঋষি, আউল, বাবা ইত্যাদি নামে পরিচিত। শেখ জাহিদ নেওয়াজ, সৈয়দ সুলতান, হাজী মুহম্মদ, শেখ চান্দ, মীর মুহম্মদ শফী, শেখ মনসুর, মোহসীন আলী, শেখ জেবু, রমযান আলী, রহিমুল্লাহ, লালন শাহ, দুদ্দু শাহ বা দবিরুদ্দীন শাহ বা দুধ মল্লিক শাহ, পাঞ্জু শাহ, পাগলা কানাই, জহরুদ্দী শাহ, ভাদু শাহ, পাঁচু শাহ, রামমোহন, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল ইসলাম, আব্দুল লতীফ, আমির আলী, ভাই গিরীশ চন্দ্র সেন উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধ সহজিয়া যোগ সাধনা ভৌগলিক ও মানসিক পরিবেশের প্রভাবে বাউল সাধনা, যোগ সাধনা, তন্ত্র সাধনা, সুফী সাধনা, ইসলামী জীবন দর্শন, মূল্যবোধ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্পকলা ইত্যাদির বহু রূপ পরিবর্তন ঘটে যার জন্য ডঃ এনামুল হক, ডঃ আহমদ শরীফ, ডঃ আব্দুল করীম, ডঃ আব্দুর রহিম, ডঃ মমতাজুর রহমান তরফদার প্রমুখ লৌকিক ইসলাম বা নব্য সুফীবাদ বলেন। পঞ্চম শতাব্দীর পর হতে বিশ শতক পর্যন্ত সমাজের কোন কোন স্তরে দেশজ ভাবধারা ও আদি ইসলামের ভাবধারা সংমিশ্রনে স্বাভাবিকভাবে ইসলামী ভাবধারা এক নতুন রূপ গ্রহণ করে। মুসলমানরা ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান, প্রথা ইত্যাদি পুরোপুরি অনুসরন করতে পারেনি ফলে সর্বত্র ইসলামী রূপের পরিবর্তন ঘটেছে। মধ্য যুগের মরমী সাধকদের এ দেশের শাস্ত্র গ্রন্থ 'অমৃত কুন্ডু' এর সাথে সুফীবাদ সমন্বয় সাধন করে কবিতা ও গানে সৃষ্টি তত্ত্ব, জন্মতত্ত্ব, আত্মাতত্ত্ব, মুরশীদ তত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, দীর্ঘজীবন লাভের যোগ তান্ত্রিক সাধনাতত্ত্ব, গর্ভ লক্ষণ তত্ত্ব, প্রান সঙ্কলিতত্ত্ব, শুক্রতত্ত্ব, নাড়ী তত্ত্ব, মৃত্যু লক্ষন তত্ত্ব, প্রায় সকল সাধক কবিদের আলোচ্য। বাঙালী দেহতত্ত্ব, জীবন রহস্য, জগৎ তত্ত্ব দীর্ঘ জীবন অমরত্ব লাভের চেষ্টা করার ফলে যোগতান্ত্রিক কায়া সাধনের মাধ্যমে অনুশীলন করে সাংখ্য, যোগ, তন্ত্র, নিরীশ্বরবাদী, ঈশ্বরবাদী, একেশ্বরবাদী প্রভৃতি দর্শন। বাংলার ভোগলিপ্সু বাঙালীর জীবন চেতনা, দীর্ঘ জীবন লাভ ও জীবনকে উপভোগ করার বাঞ্ছায় অলৌকিক শক্তিধর হওয়ার জন্য দেহাত্মবাদী যোগতান্ত্রিক সাধনা, তুকতাক, বান, টোনা, ঝাড়, ফুক, যাদু মন্ত্র, কবজ, মাদুলী, মারন, বশীকরন, অনুশীলন প্রয়োগ বিশ্বাস করে এবং একেশ্বরবাদী দর্শনের আলোকে সাধনা করে। হিন্দু মুসলমান বৈষ্ণব বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বাঙালী সাধক সন্নাসী, গুরু, বাবা, পীর, দরবেশ, গাওস, আবদাল ইত্যাদি নামের সাধকরা শিক্ষা অর্জনের বাইরে নিজস্ব মতবাদ প্রচার করে ধন্য হন। তাদের মতবাদের মাধ্যমে স্বজ্ঞা, বোধি, অপরোক্ষ অনুভূতি যা ইরানের ইবনুল আরাবী, রুমী, জামী, আব্দুল কাদের জিলানী, আল গাজ্জালী, খাজা মঈন উদ্দীন চিশতী, শেখ সাদী প্রমুখ ভারতের নিজাম উদ্দীন প্রমুখ বাংলার শেখ জাহিদ, সৈয়দ

সুলতান, হাসান রাজা, হাসান রাজার পুত্র একলিমুর রাজা, লালন শাহ, দুদ্দু শাহ, শিতলাং শাহ, খন্দকার রিয়াজুল হক, প্রমুখ প্রচার করেন। শিক্ষা অঙ্গনের বাইরে বহু পীর দরবেশ সুফী সাধক সন্ন্যাসী তাদের অন্তর্দৃষ্টির আলোকে তাদের নিজস্ব মত প্রচার করেন। অনুসন্ধানের ফলে সাধু সন্ন্যাসী বাবা সাধকগন নানা প্রশ্ন উত্থাপন করে তার সমাধান দিতে মৌলিকভাবে চেষ্টা করেন যা বর্তমান কাল পর্যন্ত চালু আছে।

১৮২৭ সালে ভারতের পশ্চিম বঙ্গে হিন্দু কলেজ ও পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে মহামতি ডিরোজিও হিন্দু কলেজে তার ইয়ং বেঙ্গলদের সাহায্যে সংশয়বাদের সুচনা করা হয় যা রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয় কুমার দত্ত, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের ব্রাহ্ম ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে হিন্দু সমাজ, ধর্ম দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে রেনেসাঁর যুগ প্রবর্তন করে রামমোহন মহাপুরুষ, সত্যদ্রষ্টা, আদিনেতা, যুগ স্রষ্টা, ভারত পথিক ইত্যাদি নামে পরিচিত হন। ১৮৫৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে ইউরোপীয় মানবতাবাদ, উপ–যোগবাদ ইত্যাদি দর্শন চর্চা চলে ও বঙ্গদেশে দেখা যায় স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, হীরালাল হালদার, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য প্রমুখ দর্শন বিদগন যারা ভারতীয় দর্শন, ধর্ম ও সাধনা, বিজ্ঞানের নানান অবদানকে তুলে ধরেন। অধ্যক্ষ দেওয়ান আজরফ, অধ্যাপক শরীফ হারুন, অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান প্রমুখ বলেন, ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে দর্শন বিভাগে হরিদাস ভট্টাচার্য যোগদান করে ডিরোজিও মত সংশয়বাদ প্রচার করে গতানুগতিক হিন্দু ধর্মের নানা বিষয়, দেব–দেবতাবাদ, সতীদাহ, পৌত্তলিক পূজা প্রভৃতি বিষয়ে সমালোচনার মাধ্যমে নতুন করে জগত ও জীবন সম্পর্কে শুরু করেন। হরিদাস ভট্টাচার্য কোন মতবাদকে নির্ভূল বলে স্বীকার করেন না, কোন ধর্মের প্রতিই তার প্রত্যয় ছিল না, ডিরোজিও বা হরিদাস ভট্টাচার্য প্রমুখের সংশয়বাদী শিক্ষা আস্তিকবাদী দার্শনিক মোমতাজ উদ্দীন আহম্মদ, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ফজলুর রহমান ও রাকেশ রঞ্জন শর্মার ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করেনি। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, হিন্দু কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়ে এ উপমহাদেশে পাশ্চাত্য দর্শনের গ্রীক দর্শন, মধ্যযুগীয় দর্শন, আধুনিক দর্শন এর মত বিভিন্ন ধারার সংশয়বাদ, অভিজ্ঞতাবাদ, বুদ্ধিবাদ, বিচারবাদ, প্রয়োগবাদ, অস্তিত্ববাদ, ভাষা দর্শন, ডিরোজিওর সন্দেহবাদ, হিতবাদ, সুখবাদ, মানব কল্যান ইত্যাদি প্রচারিত হয়ে হিন্দু ধর্ম, দর্শনাদির বহু দোষ ত্রুটি সংশোধিত হতে পন্ডিত ব্যক্তি সহ সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় সংশয়বাদী ও আধ্যাত্মবাদী মতবাদ। পাশ্চাত্য দর্শনের ব্যাপক প্রভাবের পরে বাস্তববাদী দর্শনের ক্ষেত্রে প্রখ্যাত পন্ডিত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, হীরালাল হালদার, সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, হরিদাস ভট্টচার্য, রাকেশ রঞ্জন শর্মা প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। রামমোহন রায় ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিবেকানন্দ, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ ধর্মীয় দর্শন ও ব্রাহ্ম দর্শনের ক্ষেত্রে উদার নৈতিক

মতবাদ, মানবতাবাদ, বৃক্ষলতা, গাছপালা, বহু দেবতাবাদ বর্জিত আস্তিক্য একেশ্বরবাদ, মায়াবাদ বর্জিত জীবন দর্শন, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান নীতি ইত্যাদি পালন অপেক্ষা মানব প্রেম, সমাজ কল্যান, মিল ও বেন্থামের হিতবাদ, প্রচুরতম লোকের জন্য প্রভুততম সুখ, উপযোগবাদী মানদন্ড, কর্মবাদ, মুক্তিবাদ, যুক্তিবাদী মতবাদ, পরকালের সুখ শান্তি অপেক্ষা ইহলোকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, নীতিবাদ, পূর্নবাদ বিশেষ অর্থে অবতারবাদ, জীবন দেবতাবাদ, প্রেম লীলাবাদ, অনুশীলন ধর্মবাদ, মানব কল্যানবাদ, অতিমাবনবাদ, বিজ্ঞান পুরুষবাদ ইত্যাদি মতবাদ প্রচার করেন। সমাজের বেশীরভাগ মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ, কল্যান, উন্নতি, প্রগতি, বিবর্তন কামনা করতেন, তবে ধর্মীয় ধ্যান ধারনা, আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি পালন করে বিপদ, আপন, ঋঞ্জ, ঝড, ভূমিকম্প, বন্যা, প্লাবন মুসকিল ইত্যাদি হতে মুক্তিলাভ করে শান্তি পাওয়া যায় বা যেতে পারে তা সঠিকভাবে বিবেচিত হয়নি। প্রাচীন বাংলায় কেবলমাত্র বিমূর্ত অতীন্দ্রিয় সত্তা, পরলোক সুখ চর্চা করেনি, মানুষ ও মানবিক গুনাবলীর কর্ষন নিয়েও আলোচনা করেছে। গৌতম বুদ্ধ মানবতাবাদী বিশ্বজনীন মৈত্রিতত্ত্ব, নীতি তত্ত্ব, চৈতন্যদেব প্রচারিত মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রেম-প্রীতি ইত্যাদি সমাজ কল্যানের অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

বাংলাদেশের সমাজে প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগে সব সময়ে লোকায়তিক অজিত কেশ কম্বলী, সাংখ্যকার, তান্ত্রিক, জৈন, বৌদ্ধতার্কিক, আহমদ শরীফ, শামছুর রহমান, কবীর চৌধুরী, গাফফার চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক, আরজ আলী মাতব্বর, আবুল আহসান চৌধুরী, তসলিমা নাসরিন, ফরিদা রহমান, আব্দুল মতীন, রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, আয়ুব হোসেন, সালমান রুশদী প্রমুখ বর্তমান ছিল, আছে ও থাকবে।

বাংলাদেশ ইসলামী সংস্কৃতি পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি, অধ্যক্ষ আশরাফ ফারুকী, প্রমুখ চিন্তাবিদ সংস্কৃতির রূপরেখা তুলে ধরে বলেন নাচ, গান, অভিনয়, চিত্রাংকন, ভাস্কর্য ইত্যাদি সংস্কৃতি নয় শিল্পকলা। এগুলোর মাধ্যমে যে ভাবধারা প্রকাশ পায় তা সংস্কৃতি। যে শিল্পের মাধ্যমে রুচিহীনতা ও অশ্লীলতা প্রকাশ পায় তা অপসংস্কৃতির বাহন। যে শিল্পের মাধ্যমে সত্য ও সুন্দরের প্রকাশ ঘটে তা সুস্থ সংস্কৃতির বাহন। সেটেলাইট টেলিভিশনকে দেশের একান্ত অবাঞ্চিত, জাতীয় শিক্ষা সংস্কৃতির পরিপন্থী ও শিশু কিশোরদের চরিত্র বিধ্বংসী বলে মত প্রকাশ করে সেটেলাইট টিভি বন্ধ করে দিয়ে ইসলামী সৃজনশীল ও রুচী সম্মত করে গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানানো হয়। মনে রাখতে হয় পাশ্চাত্য জগতের যুক্তরাজ্যে, ফ্রান্স, জার্মান, জাপান, ইতালী প্রভৃতি দেশ বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র মুসলমানদের সংখ্যা অধিক। ইসলামী শিক্ষার জন্য সে সব দেশে বহু মক্তব, মাদ্রাসা, মসজিদ প্রভৃতি ইসলামী স্কুল আছে। আমেরিকার সমাজ ব্যবস্থায় পারিবারিক জীবন ও দাম্পত্য জীবন বাইরে থেকে সুখকর আকর্ষনীয় ও শান্তিময় মনে হলেও বাস্তবে তা সত্য নয়। সহজ নৈতিকতার ফলে শতকরা ৮৫ জন মেয়ে, মহিলা, ছাত্রী বিয়ের আগে একাধিক

পুরুষের সাথে মেশে ও বিনা বিয়েতে সন্তান জন্ম দেয়। এ ধরনের সমাজ ব্যবস্থায় বসবাসকারী মানুষের কাছে ইসলামের মহান বানী, আল্লাহর একত্ব, নবীর নবুয়ত, ইমান, নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাত, পারিবারিক জীবন ও দাম্পত্য জীবনের কথা তুলে ধরলে তারা অনেকেই অভিভুত হয়ে পড়েন বিজ্ঞান সম্মত নিয়ম দেখে। যুক্তরাষ্ট্রের কারাগার, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম ছাত্রদের ধর্ম পালনের সুযোগ আছে। জেলে বসবাসকারী চোর, ডাকাত, সমাজবিরোধী, ধর্ষনকারী, ড্রাগ সেবীদের মাঝে ইসলামের শান্তিময় জীবন ব্যবস্থা তুলে ধরলে তারা নতুন জীবনের সন্ধান পেয়ে দলে দলে ইসলামের যোগ দেয়, নব মুসলিমদের মধ্যে 'ব্ল্যাক আমেরিকানদের' সংখ্যা বেশী। "মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই সকল মানুষ সমান, প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেক মুসলমানের ভাই" ইসলামের এই মহান বানী তাদের মুসলিম হতে অনুপ্রেরনা যোগায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কালো মুসলিম নেতা লুই ফারা খানা ইসলাম ধর্মের একেশ্বরবাদ, যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ, প্রেম, ভাব, ভক্তি, সামাজিক ন্যায় বিচার ইত্যাদির সুনীতির ফলাফল লক্ষ্য করে ইসলাম গ্রহণ করে পাশ্চাত্য জড়বাদ, বাস্তববাদ, মানবতাবাদ, সুখবাদ, নীতিবাদ, সর্বসাধারনের সর্বোচ্চ সংখ্যায় ভোগবাদ, গনতন্ত্র, মুক্তিবুদ্ধি স্বাধীনতা ইত্যাদি নীতির প্রতি ইসলামী জীবনাদর্শ অনুসরন করেন ও দশ লাখ অনুগামীদের সমাবেশ ঘটান। ইসলাম ধর্মের ঈমান, নামাজ, রোজা, হজ্ব, আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদির মধ্যে একতা দেখতে পায়। বিশ্বে শান্তি স্থাপনের জন্য বহু আন্তর্জাতিক আইন রচিত হয়, বিশ্ব বহু চেষ্টা চালায়, বহু মতবাদের জন্ম হয়। হজ্বের সময় আরাফাতের ময়দানের দৃশ্য দেখলে দেখতে পাবে বহু বর্ণ, গোত্র, সম্প্রদায়, ভাষাভাষী মানুষের জমায়েত। সেখানে সোমালিয়া, কঙ্গো, নাইজেরিয়া তথা আফ্রিকার কালো মানুষ, মিসর, তুরষ্ক, জর্দ্দান, সিরিয়া, তথা এশিয়ার হলুদ মানুষ, বসনিয়া তথা ইউরোপ আমেরিকার সাদা মানুষ, চীন মঙ্গোলিয়া, সাইবেরিয়ার শীত প্রভাবিত মানুষ, সারা দুনিয়া থেকে হরেক রকম মানুষ। রাজা বাদশাহ, কুলি, মজুর মুটে, নগরীর সকল শ্রেণীর মানুষ বর্তমান। পশ্চিমা দুনিয়া ইসলাম সম্পর্কে প্রায় আজ অন্ধকারে রয়েছে, সকল প্রকার মিথ্যা, বানোয়াট তত্ত্ব–তথ্য পরিবেশন করে তাদের মাঝে প্রাপ্ত ধারনা জিইয়ে রাখা হয়েছে। মুসলমান সন্ত্রাসী, খুনী, রক্ত পিপাসু, জালিম, বর্বর, অসভ্য, বন্য ও মৌলবাদী। ইসলামের আসল রূপ, সৌন্দর্য, বৈশিষ্ট্য ইকবাল, আবুল কালাম আজাদ, আমির আলী, আব্দুল করিম, বরকতুল্লাহ, আবুল হাশিম, আহছান উল্লাহ, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরক, সাবির আহমদ চৌধুরী, আমিনুল ইসলাম, রশীদুল আলম প্রমুখ লেখক তুলে ধরেন। চরম হিংসা ও বিদ্বেষে অন্ধ হয়ে এক শ্রেণীর পশ্চিমা লেখক, ইহুদী প্রচারক, ভিডিও, রেডিও, টেলিভিশন, স্যাটেলাইট প্রচার মাধ্যমে সংবাদ প্রচার করার মাধ্যমে যৌন সর্বস্ব ছবি, সমাজ বিরোধী পত্র পত্রিকার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে ভ্রান্ত, ঘৃন্য, মিথ্যাচার করেন। সুশিক্ষিত হলেও আমেরিকার প্রতি সেকেন্ডে একজন মহিলা ধর্ষিতা হয়, প্রতি বছর গড়ে ৭ লাখের অধিক মহিলা ধর্ষনের শিকার হন যাদের বয়স ১৮ বছর বা

তার নীচে। আতঙ্কিত হওয়ার বিষয় ১১ থেকে ১৪ বছরের কিশোরীরা মনে করে জুটি ৬ মাসের পরিচিত হলে মেয়েকে ধর্ষন করলে আপত্তির কিছু নেই। ধর্ষিতা মহিলাদের ৬১% ভাগ ১৮ বছরের নীচে, চার ভাগের তিন ভাগ ঘটনা ঘটে থাকে বন্ধু বান্ধব, নিকট আত্মীয় বা সহপাঠীদের দ্বারা। ১১ থেকে ১৪ বছরের মেয়েদের ৫১% মনে করে, ছেলেটির কাছ থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকলে ধর্ষিতা হতে কোনো বাধা নেই। ৩১% ভাগ ছেলে এবং ৩২% মেয়ের মতে অতীত যৌন অভিজ্ঞতা থাকলে ধর্ষিতা হওয়া কোন সমস্যা নয়। পাশ্চাত্য মানুষের মূল্যবোধ, রুচিবোধ ও অপরাধের বোধ পাল্টাচ্ছে। অধিকাংশ জন মনে করছে ছয় মাসের বন্ধুত্ব, টাকা প্রাপ্তির সম্ভাবনা, অতীত যৌন অভিজ্ঞতা কোনো একটি বিদ্যমান থাকলে ধর্ষন কোনো সমস্যা নয়। মহিলা, যুবতী, নারী, যুবক, ছাত্র ছাত্রী মেলামেশার ফলে নৈতিক অধঃপতন, সামাজিক অবক্ষয়, সমকামী কার্যকলাপ ইত্যাদি বৃদ্ধি পেয়ে নৈতিক দেউলিয়াপনা দেখা যায়। প্রাচীন কাল থেকে বাংলাদেশে মৈথুন তত্ত্ব, সুখবাদ, অমরত্ব লাভকারী দেহতাত্ত্বিক সাধনা, যুক্তিবাদ, পুনর্জন্মবাদ, জন্মান্তরবাদ, আত্মাবাদ, নৈরাত্মবাদ, ভাববাদ, আধ্যাত্মবাদ, জড়বাদ, বাস্তববাদ, দ্বিঈশ্বরবাদ, ত্রিতত্ত্ববাদ, দেব দেবতাবাদ, একেশ্বরবাদ, নাথ সাধনা, অমৃতকুন্ডু যোগসাধনা গ্রন্থের যোগ সাধনা, সুফী সাধনা প্রভৃতি চালু ছিল, আছে ও থাকবে, তবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মত বিবেচনা করে দর্শন রচনা করলে ভাল হয়। ইসলামের নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা, ধর্ষন, টাকা প্রাপ্তির আশায় দেহ দান, সমকাম ইত্যাদি মহাপাপ ও দন্ডনীয় অপরাধ।

অথনৈতিক সাহায্যের টোপ দিয়ে ইসলামী বিপ্লব ঠেকাতে ইউরোপীয় নয়া কৌশল শিরোনামে জনাব শাহাদত হোসেন খান এক নিবন্ধে 'দৈনিক ইনকিলাব' পত্রিকায় ইংরেজী নববর্ষ ১৯৯৬ বিশেষ সংখ্যায় বলেন গত ২৭ নভেম্বর ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ই ইউ) স্পেনের ঐতিহাসিক বার্সিলোনা নগরীতে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ১২টি দেশকে শীর্ষ সম্মেলনে আমন্ত্রন জানানো হয় যার মধ্যে একমাত্র ইসরাইল ব্যতীত সবকটি দেশ মুসলিম। এসব মুসলিম দেশ ভূমধ্যসাগরীয় দক্ষিন ও পূর্ব উপকুল জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন বার্সিলোনায় অর্থনৈতিক শীর্ষ সম্মেলনের নামে এশিয়া ও আফ্রিকার এক ডজন মুসলিম দেশকে নতুন করে আধিপত্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে চাইছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মার্কসবাদ নিয়ে কোন চিন্তা না করলেও জীবন ব্যবস্থা হিসেবে হুমকি হয়ে দাড়িয়েছে ইসলাম। মুসলিম দেশের বর্তমান লোকসংখ্যা ৩০ কোটি। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মুসলিম দেশগুলোর বেকারের ধাক্কা এসে লাগে ইউরোপীয় দেশগুলোর গায়ে। অবৈধ অধিবাসী সমস্যায় ভুগছে জার্মানী। এ সমস্যার পতন ঘটেছে ইতালীর দু'দুটি সরকারে। স্পেনের অবস্থা ও তথৈবচ। ফ্রান্স হিমসিম খাচ্ছে তার মুসলিম জনগোষ্ঠী নিয়ে। বর্তমানে ফ্রান্সে মুসলমানরা দ্বিতীয় বৃহত্তর সম্প্রদায় যাদের নিয়ে ফ্রান্সের দুশ্চিন্তার সীমা নেই। সে নিজেকে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে দাবী করলেও বাস্তবে সে খ্রীষ্টান রাষ্ট্র। ফরাসী সরকারের আচরনকে মুসলমানরা সহজভাবে মেনে নেয় না। স্কুলে হিজাব পরে আসতে না দেওয়ায় তিন জন

মুসলিম নারী আদালতের শরনাপন্ন হয়ে জয়লাভ করে। আলজেরিয়ায় অবৈধ জান্তাকে মদদ দেওয়ায় ফ্রান্সে সক্রিয় হয়ে উঠেছে ইসলামী বিপ্লবীরা। গোটা ইউরোপ জুড়ে বর্তমানে মুসলিম উত্থানের আতংক। ইউরোপ মুসলিম বিশ্বের প্রাণশক্তি নিঃশেষ করার জন্য যে অপসংস্কৃতি ভি,সি, আর, রেডিও টেলিভিশন, ক্যাসেট প্রভৃতি মারফৎ রপ্তানী করে আসছিল, তা যেন অকেজো হয়ে আসছে। পাশ্চাত্যের আগ্রাসী কর্মকান্ডের মুসলিম দেশগুলোয় বিপ্লবের আগুন জ্বলছে। মুসলমানরা আজ ইউরোপীয় বা আমেরিকার আদর্শ নিয়ে নয়, নিজেদের ইসলামী জীবনাদর্শ ও মূল্যবোধ নিয়ে বাঁচতে চায়। পাশ্চাত্যের প্রভাবমুক্ত জীবন নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চায়। মুসলমানদের গনজাগরন ইসলামী জীবনাদর্শ প্রতিরোধে ইউরোপীয় ইউনিয়ন নতুন অর্থনৈতিক সাহায্যের কথা বলে ইসলামী বিপ্লব ঠেকাতে চায়। মুসলিম দেশগুলোকে অর্থনৈতিক সহায়তা দেয়ার ছুতোয় এশিয়ার ইসলামী বিপ্লবকে প্রতিহত করতে চায়। খ্রীষ্টানদের উর্বর মস্তিষ্কে এটা পরিষ্কার যে, কমিউনিজম পৃথিবীতে ফিরে আসবে না। কমিউনিজম উত্তর বিশ্বে যদি কোন আদর্শের বিকাশ ও বিপ্লব ঘটে, তবে তা ইসলামী জীবনাদর্শ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট মার্কসবাদ নিয়ে কোন চিন্তা না করলেও জীবন ব্যবস্থা হিসেবে সেখানে হুমকি হয়ে দাড়িয়েছে ইসলাম। ইউরোপ আমেরিকা কমিউনিজমের কোন প্রত্যাবর্তন ঠেকানোর দিকে না গিয়ে ইসলাম, ইসলামী জীবন দর্শন, ইসলামী আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদির বিরুদ্ধে তথা ইসলামী অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক সাহায্যের মাধ্যমে নব জাগরন অংকুরে বিনাশ করতে চায়। মুসলমানরা সংখ্যা লঘু হয়েও মুক্তরাষ্ট্রে আরব, পাকিস্তানী, বাংলাদেশী, তুর্কী প্রভৃতি মুসলমানদের প্রভাব বাড়ছে।

জ্ঞানই আলো, অন্ধতা কুসংস্কারের কালোকে দূর করে নির্মল আলোর বন্যা নিয়ে আসে। জ্ঞান বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ চুড়ায় গর্বিত আমেরিকাসহ বিশ্বের যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানী, জাপান, রাশিয়া, চীন, ভারত, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশের ছেলে মেয়ে, নারী পুরুষ ছাত্র–ছাত্রী মেলামেশার ফলে নৈতিক অধঃপতন, সামাজিক অবক্ষয় ইত্যাদি ঘটে। ইসলামী শিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে সর্ব প্রথম মসজিদ তৈরী হয় ১৯২৯ সালে, বর্তমানে বহু মক্তব, মাদ্রাসা, মসজিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অজ্ঞতা দূর করে ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান লাভের চেষ্টা চলছে এসব দিক লক্ষ্য রেখে দর্শন রচনা করলে ভাল হয়।

"উস্‌কুনী": নজরুলের অসংকলিত রচনা

প্রীতি কুমার মিত্র*

আজ থেকে প্রায় সতেরো বছর আগে ১৯৮১ সালে গবেষণা উপলক্ষে পশ্চিম বাংলার হুগলী জেলার উত্তরপাড়ায় অবস্থিত জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরিতে কাজ করার সময় কাজী নজরুল ইসলামের একটি ক্ষুদ্র গদ্য রচনা আমার নজরে পড়ে। ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বরে রচিত এই লেখাটি ছদ্মনামী 'শ্রী উদ্‌ভ্রান্ত চৈতন্য গোস্বামী' রচিত **দন্ত বিকাশ** শীর্ষক ব্যঙ্গ পুস্তিকার মুখবন্ধ। লেখাটির শিরোনাম "উস্‌কুনী"।

দন্ত-বিকাশ একটি হাসির ছড়া ও প্যারডির বই। লেখাগুলিতে মেকি দেশপ্রেম, উগ্র হিন্দুয়ানি, সামাজিক অনাচার (যেমন বুড়ো বয়সে বালিকা বিয়ে), রাজনৈতিক ভন্ডামী, ইংরেজপ্রীতি, ইংরেজভীতি, সাংস্কৃতিক শ্যোভিনিজ্‌ম্‌, বাগাড়ম্বর, অকর্মণ্যতা, অর্থলালসা ইত্যাদি সমকালীন দুর্বলতাসমূহকে তীক্ষ্ম আক্রমণে জর্জরিত করা হয়েছে। প্রকাশক হিসেবে নাম আছে শ্রী রামরঞ্জন গোস্বামী বি.এ.–র। প্রকাশকালঃ সেপ্টেম্বর ১৯২২।

দন্ত-বিকাশের রচয়িতা 'শ্রী উদ্‌ভ্রান্ত চৈতন্য গোস্বামী'র আসল নাম উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে এই ছদ্মনামে তিনি **ধুমকেতু** পত্রিকায় অনেক ব্যঙ্গ কবিতা ও ছড়া লিখতেন। সমকালীন অন্যান্য পত্রিকাতেও তাঁর একই ধরনের লেখা প্রকাশিত হতো।

এখানে আমরা নজরুলের লেখা মুখবন্ধটি হুবহু পুর্নমুদ্রিত করছি। বিভিন্ন সংস্থা থেকে প্রকাশিত নজরুল রচনাবলীর কোথাও নজরুলের এই রচনাটি স্থান পায়নি। তাই নজরুল সাহিত্যের পাঠক–গবেষকদের সেবায় রচনাটি এখানে উপস্থাপন করা হলো।

---

* প্রফেসর, আই.বি.এস., রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উস্‌কুনী

আমাদের রস-সাগর গোঁসাই-চৈতন্য দাদা দন্ত-বিকাশ করবেন। আর তার উস্‌কুনীর ভার পড়লো আমার উপর।

দাদার দন্ত-বিকাশ-দর্শক মাত্রেরই দন্ত-বিকাশ যে অব্যর্থ, তা আমার মত খোট্টাই মেজাজের লোকও জোর করে বলতে পারে। হাসি স্বাস্থ্যের লক্ষণ, তবে আমাদের দেশের ডিস্‌পেপ্‌টিক দার্শনিক দাদাদের সম্বন্ধে কিছু বলতে পারিনে। কেননা আমরা যাতে হাসি, ওঁরা তাতে নাক সিঁট্‌কান।

চৈতন্য দাদার চৈতন- চুট্‌কি ধরে তুলে দেখাবার আর দরকার নেই। কেননা এরই মধ্যে "বিজলী" "আত্মশক্তি" "ধুমকেতু" প্রভৃতিতে তাঁর চুট্‌কির চটুল চাপল্য যে দস্তুর মত সাফল্য লাভ করেছে, তা বলাই বাহুল্য।

মেকীর বুকে এঁর মার হয়ত ঢেঁকির প্রহারের মতই বাজবে, তবু বাজাই উচিত। উদ্‌ভ্রান্ত চৈতন্যের লাঠি খাঁটিদের মাথায় পড়বে না, এ হচ্ছে আমাদের নাড়ু গোপাল ভায়াদের ন্যাড়া মাথায় উগ্র চাঁটি। তা যাদের লাগবার, লাগবেই।

এ দন্ত-বিকাশের দন্তপংক্তি (শাঁখের?) করাতের মত ***going cutting coming cutting*** *অর্থাৎ যেতেও কাটে আসতেও কাটে, এইটীই আমাকে বিশেষ করে রুদ্র আনন্দ দিয়েছে।*

যাঁর চৈতন্য উদ্‌ভ্রান্ত তাঁর সম্বন্ধে ভুলের কোন কথাই উঠতে পারে না। বিশেষ ঘনিষ্ঠ বা আত্মীয় ছাড়া কাউকে কাতুকুতু দিতে সাহস করে না কেউ, মারা ত দূরের কথা। দেশকে ভালবাসেন, দেশের লোককে বড় আপনার করে দেখেন বলেই আমার শ্রদ্ধেয় উদ্‌ভ্রান্ত চৈতন্য দাদা তাদের কাতুকুতু দিয়েছেন, অধিকারের দাবীতে হয়ত আঘাতও করেছেন। এতে যাঁদের রাগ আছে তাঁরা রাগবেন, আর যাঁদের অনুরাগ আছে তাঁরা হাসবেন। ইতি।

৭নং প্রতাপ চাটার্জ্জীর লেন, কাজী নজরুল ইসলাম
কলিকাতা।
২১শে ভাদ্র, ১৩২৯

বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণঃ ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব

মলয় কুমার ভৌমিক*

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণে ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব নিরূপণ এবং এ ব্যাপারে ব্যবসায়ের করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে এই প্রবন্ধ প্রণীত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী মানুষের নিরাপদ জীবন যাপনের পথে পরিবেশ দূষণ আজ অন্যতম প্রধান অন্তরায়। ভয়াবহ পরিবেশ বিপর্যয়ের হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষার প্রচেষ্টাও চলছে নিরন্তর। দেখা যায়, শিল্প বিপ্লবের পর থেকেই মূলত পরিবেশ দূষণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পরিবেশ দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ দায়িত্বহীন ব্যবসায় কর্মকান্ড। উন্নত বিশ্বে ব্যবসায় এই দায় স্বীকার করছে এবং ভোক্তার অধিকার রক্ষা ও নিজের অস্তিত্বের স্বার্থেই সামাজিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে পরিবেশ সংরক্ষণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। উন্নত বিশ্বের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণ এবং এ সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালার প্রয়োগ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে লক্ষ্য করা যায়, বাংলাদেশে ক্ষতিকর মাত্রায় পরিবেশ দূষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। ব্যবসায় কর্মকাণ্ডই এদেশে পরিবেশ দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ। অথচ ব্যবসায় সামাজিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে পরিবেশ সংরক্ষণে তেমন কোন ভূমিকা পালন করে না। আরো লক্ষ্য করা যায় যে, বাংলাদেশের অনেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ের সামাজিক দায় এবং পরিবেশ দূষণের ব্যাপারে আদৌ সচেতন নয়। অনেক প্রতিষ্ঠান পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ও বিধিমালা উপেক্ষা করে চলে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণে সরকারী আদেশ নির্দেশের বিরুদ্ধে ব্যবসায়কে সংঘবদ্ধ হতেও দেখা যায়। অনভিপ্রেত এসব পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পরিবেশ সংরক্ষণে ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্বের যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে এই প্রবন্ধে। এছাড়া ভোক্তার অধিকার রক্ষা এবং ব্যবসায়ের নিজস্ব স্বার্থ রক্ষার তাগিদ থেকেই পরিবেশ দূষণ রোধে সরকারের পাশাপাশি ব্যবসায়কেও এগিয়ে আসতে হবে, একথা উল্লেখ করে কতিপয় সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করা হয়েছে।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ভূমিকাঃ

বর্তমান বিশ্ব প্রধান প্রধান যেসব সমস্যায় আক্রান্ত তার মধ্যে সব চেয়ে মারাত্মক হলো পরিবেশ দূষণ সমস্যা। একটি নির্দিষ্ট এলাকার চারপাশে বিরাজমান নানা উপাদানে গড়ে ওঠে ঐ এলাকার পরিবেশ। এর মধ্যে যেমন রয়েছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ, তেমনই রয়েছে নির্দিষ্ট এলাকাটির প্রাকৃতিক পরিবেশ। জল, বায়ু, তাপ,মাটি, বৃক্ষরাজি, চারপাশের শব্দ ইত্যাদির ভারসাম্যের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে যে প্রাকৃতিক পরিবেশ, তা মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর টিকে থাকার প্রধান ও মৌলিক আধার। কিন্তু প্রাকৃতিক যেসব উপাদান পরিবেশের ভারসাম্যকে রক্ষা করে, সেসব উপাদান ক্রমেই দূষিত হয়ে পড়ছে এবং তা সাম্প্রতিক সময়ে মানুষ ও প্রাণীর বেঁচে থাকার পথে মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করছে।

পরিবেশের প্রাকৃতিক উপাদানের দূষণ, যাকে সহজ কথায় 'পরিবেশ দূষণ' বলা হয়ে থাকে, তার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। তবে এ ব্যাপারে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা একমত যে, পরিবেশ দূষণের মত সমস্যা সৃষ্টির জন্য মূলত দায়ী মানুষ নিজে। উচ্চহারে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ও অপচয় এবং এরোসল স্প্রেসহ অন্যান্য পরিবেশ বিনষ্টকারী কীটনাশকসমূহের উৎপাদন ও ব্যবহারের মাধ্যমে ফ্লোরোফ্লুরো কার্বন বিশেষত কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস বাতাসে ছড়িয়ে পড়ায় নানা রোগের উপসর্গ সৃষ্টির পাশাপাশি বিশ্বের তাপমাত্রা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এই গ্যাসগুলো ওজোন স্তরকে হালকা করে সৃষ্টি করছে ফাটল।[১] ফলে দেখা দিচ্ছে গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়া।[২] আর গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়া যদি অব্যাহত থাকে তবে অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের গাছপালা ও পশুপাখির ২০ শতাংশই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এর প্রভাবে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে সমুদ্র উপকূলবর্তী নিম্ন এলাকাসমূহ যেমন দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলো চিরতরে বিলীন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও অত্যন্ত স্পষ্ট।[৩]

পরিবেশ দূষণের সাথে অনেকগুলো উপাদান যুক্ত। এ উপাদানগুলোকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করছে উৎপাদন প্রক্রিয়া তথা সামগ্রীকভাবে ব্যবসায় কর্মকান্ড।[৪] কারখানার ধোঁয়া এবং তরল ও কঠিন বর্জ্য পরিবেশ দূষণে প্রধান ভূমিকা পালন করছে। শিল্প বিপ্লবের পর থেকে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়েছে প্রায় ২৫ শতাংশ।[৫] এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় পরিবেশের ভারসাম্যকে মানুষের জীবনের বিপক্ষে দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক কর্মকান্ড কি বিপজ্জনক ভূমিকা পালন করছে। মূলত বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি ও তার সফল প্রয়োগ পৃথিবীর জীবমন্ডলে এমন কিছু সমস্যার সৃষ্টি করেছে এবং করছে যা কেবলমাত্র স্থানীয় সমস্যা নয়, সমগ্র মানবজাতির সমস্যা। এ কারণে ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিওডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলণে পরিবেশ রক্ষার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। আর এরই আলোকে ১৯৯৭ সালে বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবসের শ্লোগান নির্ধারিত হয়েছে 'ভোক্তা ও পরিবেশ'।[৬]

পরিবেশ দূষণ মানুষের জীবনের ওপর ক্রমাগত প্রবল নেতিবাচক প্রভাব ফেলে চলেছে। মানুষ মাত্রই ভোক্তা। আর ভোক্তাকে উপলক্ষ করে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড আবর্তিত হয়। ভোক্তার জীবন বিপন্ন হয়ে পড়লে মানবজাতির অস্তিত্বই কেবল হুমকির মুখে পড়ে না, ব্যবসায়িক কর্মকান্ডও লক্ষ্যহীন হয়ে পড়ে। যে কারণে ভোক্তার স্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি ব্যবসায়ের স্বার্থ অটুট রাখার জন্যও পরিবেশ দূষণ রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যবসায় সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ হয়ে পড়ে। বিশ্বব্যাপী ভোক্তা ক্রেতার যে অধিকারগুলো স্বীকৃত এদের অন্যতম হলো, স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাসের অধিকার।[৭] ভোক্তা বা ক্রেতার এই অধিকার রক্ষার নৈতিক দায়ও ব্যবসায়ের ওপর বর্তায়। বাংলাদেশের মত অনুন্নত দেশেও সাম্প্রতিক সময়ে পরিবেশ দূষণ জীবনের ওপর গুরুতর হুমকি সৃষ্টি করছে। রাজধানী ঢাকার বাতাসে দূষণের মাত্রা রীতিমত আতংকজনক। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা এলাকার নদ–নদীর পানি ভয়াবহ মাত্রায় দূষিত হয়ে পড়েছে। শিল্প এলাকায় এই দূষণের মাত্রা সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়।

পরিবেশ দূষণ, এর কারণ ও ফলাফল বিষয়ে ইদানিং পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হচ্ছে। বিষয়টি সার্বিকভাবে খতিয়ে দেখার জন্য সরকারীভাবে গঠিত হয়েছে টাস্কফোর্স। এ সংক্রান্ত কিছু আইনেরও সংশোধন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তবে পরিবেশ দূষণ মোকাবিলায় বাংলাদেশের ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি তেমন আলোচিত হয়নি বলেই প্রতীয়ান হয়। বর্তমানে পরিবেশ দূষণের সংকটজনক পরিস্থিতি বিবেচনায় এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনার অবকাশ রয়েছে। বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশে পরিবেশ দূষণ চিন্তা উন্নত বিশ্বের তুলনায় সাম্প্রতিক। এ বিষয়ে দেশে পর্যাপ্ত তথ্য উপাত্ত নেই বললেই চলে। এ কারণে বর্তমান প্রবন্ধটি প্রধানত পরিবেশ বিষয়ক টাস্কফোর্স প্রতিবেদন এবং সাম্প্রতিক সময়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন নিবন্ধ ও রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে।

পরিবেশ দূষণ এবং এর কারণ ও ধরণ

পরিবেশ হলো একটি অবস্থার সাথে তার চারপাশের অবস্থাগুলোর (উপাদান) পারস্পরিক ক্রিয়া।[৮] মানুষের চারপাশে প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট অন্যান্য উপাদান মিলে গড়ে ওঠা যে পরিবেশ, তা যদি তার জীবন ধারণের পথে অন্তরায় হয়ে পড়ে, তখন সেই পরিবেশকে ভারসাম্যহীন পরিবেশ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। পরিবেশ, বিশেষ করে প্রাকৃতিক পরিবেশ ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ার প্রধান কারণ হলো দূষণ।

দূষণের কারণঃ অসংখ্য কারণে পরিবেশ দূষিত হতে পারে। দূষণের তিনটি প্রধান ও প্রাথমিক কারণ গুরুত্বপূর্ণ।[৯] এগুলো হলোঃ

১। ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধি,

২। ভোক্তা সমৃদ্ধি,

৩। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন।

মানুষ তার নানামুখি কর্মকান্ডের মাধ্যমে পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলে। পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা যত বাড়ছে ততই সৃষ্টি হচ্ছে পরিবেশের ওপর চাপ। এছাড়া মানুষ তার বেঁচে থাকাকে সহজ ও আয়াসসাধ্য করার প্রয়োজনে ক্রমাগত নানা উপাদানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। খাদ্য, পোষাক পরিচ্ছদ, দৈনন্দিন ব্যবহার্য অসংখ্য সামগ্রী শ্রীবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে এক শ্রেণীর মানুষের। পুরনো জিনিস ফেলে মানুষ নতুনের প্রতি ধাবিত হচ্ছে। এতে অপচয়ের পরিমাণ বাড়ছে, বাড়ছে অব্যবহৃত সামগ্রী তথা তরল ও কঠিন বর্জ্যের পরিমাণ। অন্যদিকে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে কলকারখানায় নিত্য নতুন পণ্য সামগ্রী প্রস্তুত হচ্ছে। নানা রাসায়নিক পদার্থ, বিষাক্ত দ্রব্য ও জ্বালানীর ব্যবহার বেড়ে চলেছে একই সাথে। সব মিলিয়ে পরিবেশকে ক্রমাগত দূষণ করে চলেছে এসব কর্মকান্ড।

দূষণের ধরনঃ সাধারণভাবে দূষণের চারটি ধরণ রয়েছে।[১০]

১। বায়ু দূষণ, ২। পানি দূষণ ৩। শব্দ দূষণ, ৪। কঠিন বর্জ্য থেকে দূষণ।

কোন পরিবেশের বায়ু যখন প্রাণী ও উদ্ভিদের স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য অনুপযোগী হয়ে পড়ে, তখন ঐ পরিবেশের বায়ু দূষিত হয়েছে বলা যায়।[১১] বায়ুতে মিথেন, ফ্লোরোফ্লুরো, কার্বন (সিএফসি), ওজোন, সালফার ডাই অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাই অক্সাইড, সীসা ইত্যাদির পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে তা দূষিত হয়ে পড়ে।[১২]

পানিতে যখন অক্সিজেনের পরিমাণ নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন সেই পানি বর্জ্য পরিশোধনে ব্যর্থ হয়। এ অবস্থাকে বলা হয় Biochemical Oxygen Demand (BOD)।[১৩] অর্থাৎ পানিতে BOD এর মাত্রা বেড়ে গেলে পানি দূষিত হয়ে পড়ে এবং তা জলজ উদ্ভিদ ও মাছসহ অন্যান্য প্রাণীর জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এই পানি কৃষিকাজসহ মানুষের অন্যান্য কাজে ব্যবহারের ক্ষেত্রেও হয়ে পড়ে অনুপযোগী।

গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে বেশী শব্দই হলো শব্দ দূষণ। শব্দের উৎস থেকে আধা মিটার দূরে সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য মাত্রা হলো ১০০ ডেসিবেল।[১৪] এই মাত্রা থেকে বেশি মাত্রার শব্দ মানুষের শরীরের জন্য ক্ষতিকর।

বায়ু, পানি ও শব্দ দূষণের পাশাপাশি কঠিন বর্জ্যও নানাভাবে পরিবেশ দূষণ করে থাকে। যানবাহন, নানারকম কনটেইনার ও প্লাষ্টিক সামগ্রী, পলিথিন ব্যাগ, টায়ার, কাগজ, মানুষ এবং পশুর মৃতদেহ ও কংকালসহ অসংখ্য কঠিন বর্জ্য পরিবেশ দূষণে ক্ষতিকর ভূমিকা পালন করে।এসব বর্জ্যকে প্রধান চারটি ধারায় বিভক্ত করা যায়, কৃষিজাত কঠিন বর্জ্য, শিল্পজাত কঠিন বর্জ্য, আবাসিক, বাণিজ্যিক ও প্রতিষ্ঠানিক কঠিন বর্জ্য এবং খনিজ কঠিন বর্জ্য।[১৫]

শিল্প দূষণ ও এর ফলাফল

মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম, তেল, কয়লা ও গ্যাসের ব্যবহার,বনজ সম্পদ ধ্বংস ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবেশ ক্রমাগত দূষিত হচ্ছে। তবে এই দূষণের সব থেকে বড় উৎস হলো সচল শিল্প কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং অধিকমাত্রায় যান্ত্রিক যানবাহনের চলাচল। বিশেষ করে শিল্প কারখানায় জ্বালানী ও নানা বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের কারণে আশেপাশের বায়ু ও পানি ব্যাপক মাত্রায় দূষিত হয়ে পড়ছে। একই উৎস থেকে শব্দ দূষণ এবং কঠিন বর্জ্যও সৃষ্টি হচ্ছে। শিল্প কারখানা থেকে সৃষ্ট এই দূষণ (শিল্প–দূষণ) পৃথিবী জুড়ে পরিবেশের ওপর ফেলে চলেছে বিরূপ প্রভাব। বায়ু দূষণের মাত্রা পৌঁছেছে আতংকজনক পর্যায়ে। শিল্প বিপ্লবের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ প্রায় ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৭৭৫ সালে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ ছিল প্রায় ২৭৫ পার্টস পার মিলিয়ন (পি পি এম) ১৯৯০ সালে এর পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৩৫০ পি পি এর মত। অর্থাৎ বৃদ্ধির হার ০.৪ শতাংশ করে। এই একই সময়ে বাতাসে মিথেন বেড়েছে দ্বিগুণ বা ০.৭৫ পি পি এম থেকে ১.৫ পি পি এম। কার্বনের (সিএফসি) হিসেব খুব বেশি দিনের নয়। ১৯৭৬ সালে সিএফসি–১১ ও সিএফসি–১২ এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৭৫ এবং ২০০ পিপিএম। ১৯৯০ সালে এসে এর পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৫০ এবং ৪০০ পিপিএম।[১৬]

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তঃ সরকারী প্যানেল (আইপিসিসি) এর মতে এই মুহূর্তে বায়ুমন্ডলে যে পরিমাণ গ্রীনহাউস গ্যাস আছে তা ২০২৫ সাল নাগাদ ১.৮ ফাঃ তাপ বাড়াবে এবং পরবর্তী শতাব্দীর শেষ নাগাদ এর পরিমাণ বেড়ে দাঁড়াবে ১০ ফাঃ।[১৭] এই অবস্থা যে সমগ্র পৃথিবীতে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাড়তি তাপে পৃথিবীর উত্তর মেরুতে শীতের তীব্রতা হ্রাস পাবে। ফলে বরফ গলতে শুরু করবে। ভাঙ্গন ধরবে বরফ জমা মাটির ভিতে। বেরিয়ে আসবে বিপুল পরিমাণ মিথেন। এতে পৃথিবী আরো বেশি গরম হয়ে উঠবে। বরফ গলা পানিতে আগামী ৪০ বছরের মধ্যে সাগরের পানির স্তর বৃদ্ধি পাবে আরো প্রায় ৮ ইঞ্চি। এ অবস্থায় বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, সিসিলি ও ইন্দোনেশিয়ার সাগর সংলগ্ন বিরাট এলাকা পানিতে তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। শুধু তাই নয়, এতে বিশ্বব্যাপী আবহাওয়ায় আসতে পারে অভাবনীয় পরিবর্তন। অকাল খরা অথবা অকাল বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পাবে। কৃষিতে পরিবর্তন হতে পারে ব্যাপক। পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্বের জন্যে এসব পরিবর্তনের শেষ পরিণতি মোটেই শুভ হবে না বলে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন। কারণ শুধু আজকের উৎপাদিত কার্বন ডাই অক্সাইডের অস্তিত্ব পৃথিবীতে থাকবে আরো ৫০০ বছর। মিথেন ৭ থেকে ১০ বছর, সিএফসি ৬৫ থেকে ১১০ বছর এবং নাইট্রাস অক্সাইড ১৪০ থেকে ১৯০ বছর।[১৮] আজ যদি কোনভাবে এদের উৎপাদন বন্ধ করেও দেয়া যায় তবু পৃথিবীর ভবিষ্যত প্রজন্মকে এই ক্ষতিকর কর্মকান্ডের বোঝা বইতে হবে আরো কয়েক শতাব্দি ধরে।

শিল্প কারখানা সৃষ্ট দূষণ যে শুধুমাত্র আবহাওয়ায় ব্যাপক পরিবর্তন আনছে তাই নয়, ক্যান্সার, শ্বাসকষ্টসহ ফুসফুসের বিভিন্ন রোগ, চর্মরোগ স্নায়ুবিক রোগ, হৃদরোগ, ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, ডার্মাটোটিস, কনজাংটিভাইটিসহ অসংখ্যা মারাত্মক রোগ ইতোমধ্যেই পৃথিবীর মানুষের জীবন বিপন্ন করে তুলেছে।[১৯]

পরিবেশ ও ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব

ব্যবসায় কখনই কেবল শূণ্যের ওপর টিকে থাকতে পারে না। ব্যবসায় তার আশপাশের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত। পরিবেশের বাহ্যিক যেসব অবস্থা (external forces) ব্যবসায়ের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে, ব্যবস্থাপনাকে সেসব বিষয় অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হয়। আর এই অবস্থাগুলোর অস্তিত্ব রয়েছে সমাজের অভ্যন্তরেই। ব্যবসায়কে তাই নিজ অস্তিত্বের স্বার্থেই তার আর্থিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি সামাজিক কর্মকান্ডের প্রতি নজর দিতে হয়।[২০] ব্যবসায়ের কাছ থেকে মালিক যেমন মোটা অংকের মুনাফা দাবী করে, তেমনই সরকার প্রত্যাশা করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন। অন্যদিকে ব্যবসায়ের কাছ থেকে শ্রমিক–কর্মী আশা করে চাকুরীর সুযোগ, উঁচু মজুরী ও কাজের উপযুক্ত পরিবেশ, আর ভোক্তা চান পরিমিত মূল্যে উন্নতমানের পণ্য বা সেবা। ব্যবসায় এসব প্রত্যাশা পূরণ করতে গিয়ে আপনা আপনিই সামাজিক ক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। একই কারণে তাকে সামাজিক দায়ও বহন করতে হয়।

এক সময় মিল্টন ফ্রিডম্যানের মতো অর্থনীতিবিদরা বিশ্বাস করতেন ব্যবসায়ের একমাত্র দায়িত্ব হলো, মুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে বৈধ পন্থায় সম্পদ ব্যবহার করে মুনাফা অর্জন করা।[২১] কিন্তু এই ধারণা এখন পাল্টে গেছে। আজকের দিনে ব্যবসায়ের সমাজের প্রতি দায়িত্বের ব্যাপারে আর কোন বিতর্ক নেই। তাই আজ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে আর্থিক বিষয়ের পাশাপাশি আর যেসব বিষয়ে ব্যবস্থাপকদের লক্ষ্য রাখতে হয় তা হলো, প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মীদের সার্বিক আচরণ, সামাজিক নীতিমালার প্রতি প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গী, সামাজিক পরিবেশের সুস্থতার প্রতি সচেতনতা এবং সর্বোপরি প্রাত্যহিক ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের বাইরে সমাজ উন্নয়নে অর্থ ব্যয়ের জন্য আগ্রহ। বর্তমান বিশ্বে ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্বের ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলো নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রধান যুক্তি হলোঃ

১। ব্যবসায়ের অবস্থান সমাজের মধ্যেই এবং ব্যবসায় তার নিজের অজান্তেই সামাজিক বিষয়সমূহের সাথে সম্পৃক্ত।

২। ব্যবসায় সামাজিক উন্নয়নের ফসলের প্রধান ভাগীদার।

৩। সামাজিক সমস্যাসমূহের সমাধানে ব্যবসায়েরই প্রয়োজনীয় সম্পদ রয়েছে।[২২]

ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব বিভিন্নমুখী। একমাত্র শিল্প দূষণ রোধ করাই ব্যবসায়ের দায়িত্ব নয়। কিন্তু উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট শিল্পদূষণের এই সমস্যাকে ব্যবসায়ের এড়িয়ে যাওয়ারও কোন উপায় নেই; বরং সাম্প্রতিক সময়ে এই দায়িত্বটি ব্যবসায়ের জন্যে অন্যতম মুখ্য একটি দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সমাজ, বিশেষ করে সমাজের মূল্যবোধের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্বেরও পরিবর্তন ঘটে। যেমন এক সময়ে কৃষির জন্য কীটনাশক উৎপাদন করে ক্ষুধার্ত পৃথিবীকে রক্ষা করাই ব্যবসায়ের প্রধান দায়িত্ব ছিল। কিন্তু কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে পরিবেশ রক্ষায় ভূমিকা পালনই আজকের বিশ্বে ব্যবসায়ের অন্যতম সামাজিক দায়িত্ব।[২৩]

এখন প্রশ্ন হলো সামাজিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বাস্তবে ব্যবসায় কি ধরনের কৌশল অবলম্বন করবে? ব্যবসায় সামাজিক দায়িত্ব পালনে নিচের যে কোন কৌশল গ্রহণ করতে পারে।[২৪]

ক. প্রতিক্রিয়া কৌশলঃ যে অবস্থায় ব্যবসায় তার দায়িত্ব অস্বীকার করে নিজের বিশ্বাসে অটল থাকে। যেমন ভারতের ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার ব্যাপারটি আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল।

খ. আত্মরক্ষা কৌশলঃ এ ক্ষেত্রে সরকারী কোন বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে ব্যবসায়ী সংগঠনগুলো একত্রে দাঁড়ায়। যেমন কয়েক বছর আগে বাংলাদেশে ক্ষতিকর পলিথিন ব্যাগ উৎপাদনের বিরুদ্ধে সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করলে পলিথিন ব্যাগ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সম্মিলিতভাবে এর প্রতিবাদ করে এবং এখন পর্যন্ত সরকার তার ঐ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে পারেনি।

গ. সহনশীল কৌশলঃ যখন কোন স্বার্থান্বেষী গ্রুপ কিংবা সরকারী চাপের কারণে অধিক মাত্রায় সামাজিক দায়িত্ব কাঁধে নিতে হয়। যেমন সরকার অথবা স্থানীয় প্রশাসনের অনুরোধে ব্যবসায়কে অনেক সময় সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজনে পৃষ্ঠপোষকতা করতে হয়।

ঘ. অতি সক্রিয় কৌশলঃ সক্রিয়ভাবে সামাজিক উন্নয়নে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিবেদিত হওয়াকে ব্যবসায় যখন কর্তব্য মনে করে। যেমন বাংলাদেশে একটি তামাকজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করছে।

সামাজিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের কাছ থেকে ওপরে উল্লেখিত কৌশলগুলোর মধ্যে অতি সক্রিয় কৌশলই কাম্য। সাম্প্রতিক সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের উর্ধতন স্থাপকদের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পরিচালিত এক জরিপেও দেখা গেছে, ব্যবস্থাপকরা সক্রিয় ভূমিকা পালনের প্রতি বেশি আগ্রহী।[২৫] প্রকৃতপক্ষে আধুনিক ব্যবস্থাপনার এই যুগে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনুধাবন করতে হবে যে, সামাজিক দায়িত্ব পালন প্রতিষ্ঠানের সর্বোত্তম স্বার্থ উদ্ধারের জন্যই প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানগুলোকে এটাও বুঝতে হবে,

ব্যবসায়ের দীর্ঘস্থায়ী সমৃদ্ধির জন্য সামাজিক ভাবমূর্তি অত্যাবশ্যক। আর সামাজিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে খ্যাতিমান না হয়ে সেই ভাবমূর্তি অর্জন করা সম্ভব নয়।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে কেবল নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্যই যে সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হবে এমন নয়, ভোক্তা অধিকার রক্ষায়ও তাকে এগিয়ে আসতে হবে। বিশ্বব্যাপী ভোক্তা অধিকারের ব্যাপারে সচেতনতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ব্যাপারে রয়েছে আইনগত বাধ্যবাধকতাও। ভোক্তার নিরাপত্তার অধিকার, জানা, শোনা এবং পছন্দের অধিকার বিশ্বব্যাপী আজ স্বীকৃত। এই অধিকার রক্ষা, বিশেষ করে ভোক্তার জন্য বিষমুক্ত খাবার, পানি এবং নির্মল স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করা ব্যবসায়ের সামাজিক দায়ের অন্তর্ভূক্ত।

একথা ঠিক যে, এমন অনেক সামাজিক দায় রয়েছে যেগুলো ব্যবসায় ইচ্ছে করলে এড়িয়েও যেতে পারে। কিন্তু পরিবেশ দুষণের মত মারাত্মক ক্ষতিকর অবস্থা যা প্রধানত ব্যবসায় নিজেই সৃষ্টি করছে তা এড়িয়ে যাওয়ার মত কোন অযৌক্তিক অজুহাত ব্যবসায় কখনোই দাঁড় করাতে পারে না। অবশ্য পরিবেশ দুষণের পেছনে ব্যবসায় কর্মকাণ্ড কতটা দায়ী এবং পরিবেশ সংরক্ষণের দায়ের কত অংশ ব্যবাসায়কে বহন করতে হবে– এ প্রশ্ন উঠতে পারে। চুলচেরা হিসেব করে এ প্রশ্নের জবাব হয়তো কেউ দিতে পারবে না, তবে একথা পৃথিবীব্যাপী আজ স্বীকৃত যে, পরিবেশ দুষণের অন্যতম প্রধান কারণ ব্যবসায় কর্মকাণ্ড। আর পরিবেশ সংরক্ষণে সিংহভাগ দায় বহন করতে হবে ব্যবসায়কেই। কেননা যেসব কারণে পরিবেশ দুষিত হয়, সেসব কারণের প্রায় সবগুলোর সাথেই ব্যবসায়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পৃক্ততা রয়েছে। এ প্রশ্নে আমেরিকার পরিবেশের মান বিষয়ক একটি কাউন্সিল (Council On Enviornmental Quality) প্রণীত হিসেব প্রনিধানযোগ্য। ঐ কাউন্সিল আমেরিকার পরিবেশ দুষণ রোধে ১৯৭৯ সালে ১০ বছর মেয়াদী একটি কর্মসূচী তৈরী করে। এর জন্য ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয় ২৭১ বিলিয়ন ডলার। এই অর্থের মধ্যে মাত্র ৫৬ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ শতকরা ২০ ভাগ সরকারী তহবিল থেকে দেয়ার প্রস্তাব করা হয়। বাদবাকী ২১৫ বিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৮০ ভাগ অর্থই গ্রহণ করতে বলা হয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে।[২৬]

বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণ

শিল্পায়ন, নগরায়ন, যানবাহন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্যে চাপের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের ছোট বড় বেশ কিছু শহরের শিল্পাঞ্চলে পরিবেশের মারাত্মক অবনতি লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশ শিল্পে অনুন্নত হলেও পরিবেশ সম্পর্কে অসচেতনতা, ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের উৎপাদন প্রক্রিয়া, ত্রুটিপূর্ণ যানবাহনের ব্যাপক চলাচল এবং আমদানীকৃত পণ্যের নানামুখী

ব্যবহারের কারণে শিল্পোন্নত দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণ পরিস্থিতি অনেক বেশী নাজুক।

বাংলাদেশের পরিবেশ অতিদ্রুত ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার আর একটি প্রধান কারণ হলো বনভূমির স্বল্পতা। বৃক্ষ কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের মতে কোন দেশের পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখতে শতকরা অন্তত ২৫ ভাগ এলাকায় বনভূমি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশের মোট ভূমির মাত্র শতকরা ৭ ভাগ এলাকায় বনভূমি আছে। ব্যাপক বৃক্ষ নিধনের কারণে ১৯৭২ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত দেশের ৯ ভাগ বনভূমি ধ্বংস হয়ে গেছে। অথচ জাপানে বনভূমি মোট এলাকার শতকরা ৬৩ ভাগ, রাশিয়ায় শতকরা ৫১ ভাগ, আমেরিকায় ৩৪ ভাগ, আমাদের প্রতিবেশী মায়ানমার এবং ভারতে বনভূমির হার যথাক্রমে শতকরা ৬৭ ভাগ এবং ২২ ভাগ।[২৭] বৃক্ষ নিধন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায় বাংলাদেশের স্বল্প পরিমাণ বনভূমিও ক্রমাগত উজাড় হয়ে যাচ্ছে। আর বৃক্ষহীন এই দেশে সামান্য দূষণ প্রক্রিয়াই পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলছে অনেক বড় আকারে।

১৯৮৫ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত দেশের মোট ৭ হাজার ১৮৫টি শিল্প কারখানা জরিপের ফলাফল থেকে দেখা গেছে, প্রায় প্রতিটি কারখানাই কমবেশী পানি ও বায়ু দূষণের জন্য দায়ী। এর মধ্যে ১১৭৬টি কারখানাকে 'তীব্র দূষণকারী শিল্প' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ঢাকা বিভাগে ৪৫০টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ৩৭০টি, খুলনায় ২৯০টি এবং রাজশাহী বিভাগে ৬৬টি তীব্র দূষণকারী শিল্পকারখানা রয়েছে।[২৮] ঢাকায় সবচেয়ে বেশি পরিবেশ দূষণ করছে ট্যানারী শিল্প। হাজারীবাগ এলাকাতেই রয়েছে ৩'শ ট্যানারী শিল্প প্রতিষ্ঠান। এ থেকে দৈনিক প্রায় ১৬ হাজার ঘনমিটার শিল্প বর্জ্য ফেলা হয় খোলা আকাশের নিচে। এছাড়া এগুলোর বয়লার থেকে বের হওয়া সালফার ডাই অক্সাইড, কার্বন ডাই অক্সাইড ও নাইট্রোজেন অক্সাইড প্রতিনিয়ত ঘটিয়ে চলেছে দূষণ-ক্রিয়া।[২৯]

খুলনায় ছোট বড় প্রায় ৩'শ শিল্প কারখানা থেকে প্রতিদিন এক কোটি গ্যালন তরল বর্জ্য ভৈরব নদীতে ফেলা হয়। শুধুমাত্র খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল থেকেই দৈনিক ৪৬ লাখ গ্যালন তরল বর্জ্য ভৈরবে নির্গত হয় বলে খুলনা পরিবেশ অধিদপ্তর জানায়।[৩০] একই কারণে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীও আজ ব্যাপক দূষণের শিকার।

দেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কারখানায় গ্যাসের পাশাপাশি ব্যবহৃত হয় পেট্রোল ও ডিজেল। এই পেট্রোল ও ডিজেল সম্পূর্ণরূপে না পোড়ায় দূষিত ধোঁয়া বেরিয়ে আসে কারখানাগুলোর চিমনি দিয়ে। এছাড়া লোডশেডিং ও বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে বিভিন্ন শিল্প বাণিজ্য সংস্থায় যে হাজার

হাজার জেনারেটর ব্যবহৃত হয় তা থেকে নির্গত ধোঁয়াও ব্যাপকভাবে পরিবেশকে দূষিত করে থাকে।

যানবাহনের কালো ধোঁয়া বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণের আর একটি বড় উৎস। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের মতে, রাজধানীর ২ হাজার কিলোমিটার রাস্তায় প্রতিদিন বৈধ অবৈধ মিলিয়ে আড়াই লাখ মোটরযান চলাচল করে, যা সারা দেশের মোট মোটরযানের এক-তৃতীয়াংশের বেশি। এই আড়াই লাখের শতকরা ৭৫ ভাগই কালো ধোঁয়া এবং কার্বন মনোক্সাইড নির্গমনকারী।[৩১] বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বি আর টি এ) এবং পুলিশের সহযোগিতায় মার্চ '৯৭-এ ঢাকায় ২১৩টি মোটরযানের ওপর এক জরিপ চালানো হয়। এতে দেখা যায়, ২১৩টির মধ্যে ১৭৫টিই কালো ধোঁয়া ও কার্বন মনোক্সাইড নির্গমনকারী। জরিপে ট্রাক ও বাসের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১২৯ ও ৫৪টি। এর শতকরা ৮২ ভাগ ট্রাক ও বাস পরিবেশ দূষণকারী।[৩২]

দুই ষ্ট্রোক ইঞ্জিনের গাড়ী সব থেকে বেশি কালো ধোঁয়া নির্গমন করে। অটোরিকশা ও অটোটেম্পো হলো দুই ষ্ট্রোক ইঞ্জিনের গাড়ী। গত ৭ বছরে অটোরিকশা ও অটোটেম্পোর রেজিষ্ট্রেশন ৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারী হিসেবে এর সংখ্যা ৪২ হাজার। কিন্তু বেসরকারী হিসেবে এগুলোর সংখ্যা এক লাখ ২২ হাজারের বেশি।[৩৩]

ষাটের দশকে ক্ষতিকর ডিডিটি'র বিরুদ্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পরিবেশ বিজ্ঞানীরা সোচ্চার হন। এর ফলে ঐ দশকেই ইউরোপ এবং এশিয়ার অনেক দেশ কীটনাশক হিসেবে ডিডিটি'র ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। অথচ বাংলাদেশে আজও লাগামহীনভাবে প্রাণঘাতী ডিডিটি ব্যবহৃত হচ্ছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসেবে বাংলাদেশে প্রতি বছর ৭ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। কৃষকরা অজ্ঞানতাবশত শাক সব্জিতে সপ্তাহে কমপক্ষে দু'বার ডিডিটি ও ফফোমিডান নামের বিষাক্ত কীটনাশক ব্যবহার করে থাকে। বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনের গবেষণায় শাক সবজি এবং শুটকি মাছে বিষাক্ত কীটনাশকের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। অধিকাংশ শুঁটকি মাছেই আশংকাজনক পরিমাণে ডিডিটি কেন্দ্রীভূত আছে বলে তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়।[৩৪] বাজারে বহু নকল মশার কয়েলে ব্যবহৃত হয় ডিডিটি। এসব কারণে দেশে ব্যাপক আকারে ক্যান্সার ও বিভিন্ন স্নায়ুবিক রোগ ছড়িয়ে পড়ছে। রাসায়নিক সারের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারও পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী। ষাট দশক থেকে শুরু করে দেশে ক্রমবর্ধমান হারে সার ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমানে দেশে রাসায়নিক সারের ব্যবহারের পরিমাণ বছরে ১৭.৩ লাখ মেট্রিক টন।[৩৫] সার ও কীটনাশকের অযোগ্য ব্যবহার জমির উৎপাদিকা শক্তিতে দীর্ঘ মেয়াদী সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

আর্সেনিক দূষণ সমস্যা বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণে ভয়াবহ নতুন মাত্রা যোগ করেছে। দেশে ৩ কোটি ষাট লাখ লোকের জীবন আর্সেনিক বিষক্রিয়ার হুমকির মুখে।[৩৬] ভূগর্ভের পানির অপরিকল্পিত ব্যবহারই আর্সেনিক সমস্যা সৃষ্টির প্রধান কারণ।[৩৭] এছাড়া সার, কীটনাশক ইতাদির মাত্রারিক্ত ব্যবহারের ফলেও আর্সেনিক সমস্যা সম্প্রসারিত হচ্ছে। খাবার পানি, আইসক্রীম, ভেজাল দুধসহ বিভিন্ন খাদ্য ও পানীয় এভাবে আর্সেনিক যুক্ত হয়ে পড়েছে। মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে নানা জটিল রোগে।

দেশের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের যথেচ্ছ ব্যবহার হচ্ছে। বার্নিস, রঙ, আলকাতরা, ডিডিটি, এসিড, ফিনাইল, কার্বাইড, গন্ধক, বারুদ, ক্লোরিন ইত্যাদির সতর্ক ব্যবহার এদেশে লক্ষ্য করা যায় না। ঢাকার পরিবেশ দূষণের অন্যতম আর একটি কারণ বিভিন্ন ক্লিনিক ও প্যাথলজিক্যাল সেন্টারে ব্যবহৃত বর্জ্য। এসব বর্জ্য ফেলে রাখা হয় খোলা নর্দমায়। পলিথিন ব্যাগ ও পলিথিন সামগ্রী মাটিতে মিশে মাটির উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট করে দেয়। অথচ দেশে ১৯৮২ সাল থেকে এসব সামগ্রী ব্যাপকভাবে উৎপাদিত হচ্ছে।[৩৮]

বায়ু দূষণঃ বায়ু দূষণের উৎসকে স্থির ও চলমান এই দু'ভাগে ভাগ করা যায়। স্থির উৎসের মধ্যে শিল্পকারখানা, পাওয়ার প্লান্ট এবং বর্জ্য পদার্থের দহন (refuse incineration) উল্লেখযোগ্য। চলমান উৎস প্রধানত যানবাহনের ধোঁয়া।[৩৯] বাংলাদেশে উভয় উৎস থেকেই বায়ু দূষিত হচ্ছে। তবে শহরে বায়ু দূষণের প্রধান উৎস যানবাহনের ধোঁয়া। ঢাকা মহানগরীর বাতাসে সীসার (যার উৎস কালো ধোঁয়া) ঘনত্ব পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের বিজ্ঞানীদের হিসেবে ঢাকার বাতাসে সীসার ঘনত্ব হার প্রতি ঘন মিটারে ৪৬৩ ন্যানোগ্রাম (এক গ্রামের ১০০ কোটি ভাগের এক ভাগ), দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে মেক্সিকো সিটি (প্রতি ঘন মিটারে ৩৮৩ ন্যানোগ্রাম) ও ভারতের মুম্বাই শহর।[৪০] বাতাসে যেসব উৎস থেকে সীসা মিশ্রিত হয় তার ৯০ ভাগই আসে যানবাহন থেকে। পরিবেশ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী কালো ধোঁয়া সৃষ্টিকারী গাড়িগুলো সীসা ছাড়াও আরো ৪টি পরিবেশ দূষক বাতাস ছড়াচ্ছে। এগুলো হলো কার্বন মনোক্সাইড, হাইড্রো কার্বন, সালফার ডাই অক্সাইড ও নাইট্রোজেন।[৪১] বাংলাদেশে বেশিরভাগ শিল্প কারখানার চিমনি অনেক উঁচুতে স্থাপিত না হওয়ার কারণে নির্গত ধোঁয়া পৃথিবী পৃষ্ঠের কাছাকাছি ঘনীভূত হয়ে বায়ু দূষণের মাত্রাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। কারখানা নির্গত এই ধোঁয়ায় শ্রমিকদের স্বাস্থ্যহানি ঘটছে ব্যাপকহারে। এদিকে সীসার প্রভাবে স্নায়ুবিক রোগ, বিশেষ করে শিশুদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। দেশে ফুসফুসের ক্যান্সার, হৃদরোগ, ব্রংকাইটিস, অ্যাজমা, নিউমোনিয়া, যক্ষা ইত্যাদি রোগের ব্যাপকতার জন্যও দায়ী করা হচ্ছে বায়ু দূষণকে।[৪২] এর পাশাপাশি গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়ার হুমকিতো রয়েছেই, যে প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে বাংলাদেশের মত দেশই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সব থেকে বেশি।

পানি দূষণঃ বিশ্বের প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ তাদের দৈনন্দিন কাজ এবং কৃষি ও পণ্য উৎপাদনের জন্য পানির প্রাকৃতিক উৎসগুলোর উপর নির্ভরশীল। আর মানুষের জন্য প্রাকৃতিক পানির প্রয়োজন বলতে মিঠা পানির প্রয়োজনকেই বোঝায়। অথচ শিল্প বর্জ্য, কৃষিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্য এবং পারিবারিকভাবে পরিত্যক্ত বর্জ্য সহ প্রায় সব ধরণের বর্জ্যই ফেলা হয় মিঠা পানির উৎসগুলোতে। বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে মাত্র ৬০ বছর পর মিঠা পানির প্রাকৃতিক উৎসগুলো আর মানুষের ব্যবহার উপযোগী থাকবেনা।[৪৩] তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অবস্থা আরো বেশি ভয়াবহ। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) ১৯৯৪ সালের বিপোর্ট অনুযায়ী তৃতীয় বিশ্বের নদী অববাহিকাগুলো শিল্পবর্জ্য এবং কৃষিতে ব্যবহার্য রাসায়নিক দ্রব্যের দ্বারা এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত যে বর্তমান রাসায়নিক দূষণ অব্যাহত থাকলে ২০৫০ সালের মধ্যে এসব অববাহিকার ভূমি চরমভাবে অনুর্বর হয়ে পড়বে, এমনকি এগুলো রাসায়নিক মরুভূমিতেও রূপান্তরিত হতে পারে।[৪৪]

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) রিপোর্টে বলা হয়েছে, পানি যেভাবে দূষিত হচ্ছে তাতে আগামী শতাব্দীর শেষ নাগাদ আমাদের জল সেচের জন্য নদীর উপর ভরসা ছেড়ে দিতে হবে। উন্নত বিশ্বে ইতোমধ্যেই পানির সংকট দেখা দিয়েছে। বিশ্বে পানি বাহিত রোগের হার ব্যাপক মাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অবস্থা খুবই খারাপ। এসব দেশে ৮০ শতাংশ রোগ দূষিত পানি বাহিত। বর্তমান বিশ্বে প্রতি বছর এক কোটিরও বেশি মানুষ পানি বাহিত রোগে মারা যায়। এর মধ্যে ৯৫ শতাংশেরও বেশি উন্নয়নশীল বিশ্বের মানুষ। শুধুমাত্র পানি বাহিত রোগ প্রতিরোধ করতে আগামী ১০ বছরে বিশ্বব্যাপী এই খাতে ৬ হাজার কোটি ডলার যোগান দিতে হবে। WHO এর রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয়েছে উন্নয়নশীল ৮০টি দেশের ১০০ কোটি মানুষ পান করার জন্য বিশুদ্ধ পানি পাচ্ছে না।[৪৫]

FAO এবং WHO এর রিপোর্ট থেকে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। পরিবেশ অধিদপ্তর পরিচালিত জরিপে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের ১,২০০ এর বেশি শিল্প কারখানা প্রতিদিন প্রায় ৫ হাজার কিউবিক মিটার বর্জ্য পদার্থ নদীর পানিতে ফেলে। পরিবেশ অধিদপ্তর নদনদীর পানি দূষণের প্রধান কারণ হিসেবে শিল্প বর্জ্যের কথা বলেছে।[৪৬] তীব্র দূষণকারী শিল্প বর্জ্যের কারণে বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষা, ভৈরব, রূপসা ও কর্ণফুলী নদীর পানি ইতোমধ্যেই দূষিত হয়ে পড়েছে। বুড়িগঙ্গার পানিকে দূষিত করছে হাজারীবাগের চামড়া শিল্প, নদী তীরবর্তী টেক্সটাইল মিল (ডাইং এন্ড ফিনিসিং) এবং ঢাকা ওয়াসার বিপুল পরিমাণ পয়ঃ বর্জ্য। তুরাগের পানি দূষিত হচ্ছে টঙ্গীর শিল্প বর্জ্য দ্বারা। শীতলক্ষ্যার পানি দূষণের কারণ গোদনাইল, কুতুবআইল, সান্তাপুর, পাঠানটুলী প্রভৃতি এলাকার ডাইং ও প্রিন্টিং শিল্প থেকে নদীতে ফেলা বর্জ্য। ভৈরব ও রূপসার পানি প্রধানত গোয়ালপাড়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বর্জ্য দ্বারা দূষিত

হচ্ছে। কর্ণফুলী কাগজ কলের বর্জ্য দ্বারা দূষিত হচ্ছে কর্ণফুলী নদী।[৪৭] নদীর পানিতে বায়োকেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড (BOD) এর সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য মাত্রা ৫০ মিলি লিটার থাকার কথা। কিন্তু এসব নদীতে (BOD) - এর মাত্রা স্থান ভেদে ৪০০ থেকে ৫০০ মিলি লিটার পর্যন্ত। বর্তমান ধারা চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে এসব নদীর পানিতে প্রাণের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। সেই সাথে কৃষিকাজসহ অন্যান্য কাজে এসব নদীর পানি ব্যবহার উপযোগিতা হারাবে।[৪৮] সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে পানি দূষণের অন্যতম বড় কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছে পানিতে আর্সেনিক সম্পৃক্ততা। দেশের সাড়ে ৩ কোটিরও বেশি লোক এখন পানিতে আর্সেনিক বিষক্রিয়ার হুমকির মুখে। অপরিকল্পিতভাবে নলকূপের মাধ্যমে ভূগর্ভ থেকে পানি উত্তোলন এবং কৃষি জমিতে সার ও কীটনাশকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারই পানিতে আর্সেনিক বিষক্রিয়া সৃষ্টির প্রধান কারণ। দৃশ্যত আর্সেনিক বিষক্রিয়ার সাথে ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের সম্পর্ক নেই মনে হলেও বিষক্রিয়ার উল্লেখিত কারণের প্রতি লক্ষ করলে বোঝা যায়, আর্সেনিক দূষণের ক্ষেত্রে আংশিক হলেও ব্যবসায়ের দায় দায়িত্ব রয়েছে। কেননা ভূগর্ভ থেকে পানি তোলার জন্য গভীর-অগভীর নলকূপ এবং কৃষি জমিতে ব্যবহারের জন্য সার ও কীটনাশক উৎপাদন এবং বিক্রির সাথে ব্যবসায় সম্পৃক্ত।

শব্দ দূষণঃ বাংলাদেশে বায়ু ও পানি দূষণের মাত্রা সংকটজনক। সে তুলনায় শব্দ দূষণের মাত্রা তত ভয়াবহ নয়। তবে শহর ও শিল্পাঞ্চলের কোন কোন স্থানে এর মাত্রা অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। যানবাহনের অনিয়ন্ত্রিত হর্ণ এবং কিছু কিছু কারখানার বিকট শব্দ প্রধানত শব্দ দূষণের জন্য দায়ী। ঢাকার হাজারীবাগ, রায়ের বাজার, ধোলাইখাল, নারিন্দা, ওয়ারি, সায়েদাবাদ, গাবতলী, যাত্রাবাড়ী, জুড়াইন, দোলাইপাড়, ফরাশগঞ্জ, সূত্রাপুর, ইসলামপুর, নাখালপাড়া, ইসলামবাগ, তেজগাঁ, মিরপুর এমনকি ধানমন্ডি ও উত্তরার মত আবাসিক এলাকাতেও অজস্র শিল্প কারখানা ও যানবাহনের বিরামহীন শব্দ এলাকার বাসিন্দা ও ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনকে প্রতিনিয়ত দূর্বিসহ করে তুলেছে।[৪৯]

কঠিন বর্জ্য থেকে দূষণঃ পলিথিন ব্যাগ, প্লাস্টিক সামগ্রী, ক্লিনিকে ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিত্যাক্ত সামগ্রীসহ দৈনন্দিন ব্যবহার্য অনেক কঠিন বর্জ্য এবং শিল্প কারখানা সৃষ্ট বিপুল পরিমাণ কঠিন বর্জ্যও দেশের নদনদী ও বায়ু দূষণ করে চলেছে। পরিবেশ অধিদপ্তর পরিচালিত এক সমীক্ষা থেকে জানা যায়, কেবলমাত্র ঢাকা ও আশপাশের এলাকাতেই প্রতি বছর বিভিন্ন শিল্প থেকে প্রায় ১৪ হাজার টন কঠিন বর্জ্য নদনদীতে ফেলা হচ্ছে।[৫০] আর এসব বর্জ্য দূষণক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবেশের ওপর সৃষ্টি করে চলেছে মারাত্মক চাপ।

পরিবেশ সংরক্ষণে আইন, বিধি বিধান ও তার প্রয়োগ পরিস্থিতি

বাংলাদেশে ১৯৯২ সালে জাতীয় পরিবেশ নীতি প্রণীত হয়। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন ও জারি করা হয় ১৯৯৫ সালে। আইন প্রণয়ন করা হলেও ১৯৯৭ সালের ২৮শে আগস্টের পূর্ব পর্যন্ত পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালার অভাবে এ আইন প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি। তবে ১৯৯৭ সালের ২৮শে আগস্ট বাংলাদেশ সরকার গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা জারি করলে পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ আইন প্রয়োগের বাধা দূর হয়।[৫১] এই আইনে পরিবেশ দূষণকারীর বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ৫ বছর কারাদণ্ড এবং ২ লাখ টাকা জরিমানার বিধানসহ অন্যান্য শাস্তিমূলক বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়া পরিবেশের মানমাত্রা (environmental quality standard) নির্ধারণ করা হয়েছে এই বিধিমালায়। পরিবেশের মানমাত্রা নির্ধারিত না হওয়ায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের কাজ বিঘ্নিত হয়ে আসছিল।

১৯৯৫ সালে প্রণীত পরিবেশ সংরক্ষণ আইন বিধিমালা অভাবে ১৯৯৭ সালের ২৭শে আগস্ট পর্যন্ত অকার্যকর হওয়ায় এই আইনের প্রয়োগ বিষয়ে আলোচনার কোন অবকাশ নেই। তবে এই সময়ের আগে দেশে মোটরযান অধ্যাদেশ '৮৩ এর মাধ্যমে যানবাহনের কালো ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তরের বেশ কিছু নিয়মনীতি ও নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এ ধরনের প্রচেষ্টা এবং তার ফলাফল বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর উদ্ধৃতি দিয়ে জাতীয় দৈনিকগুলোতে বেশ কিছু প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। দেশে পরিবেশ দূষণ নিরাময়ের ক্ষেত্রে সার্বিক অবস্থা, বিশেষ করে দেশে ব্যবসায়ের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে জানার জন্য এসব প্রতিবেদনের কিছু বিষয় আলোচনার অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।

বাংলাদেশে যে ১১১৭টি শিল্প কারখানাকে তীব্র দূষণকারী শিল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, পরিবেশ অধিদপ্তর সেসব প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট স্থাপনের জন্য একাধিকবার নোটিশ দেয়। অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে বিষয়টির গুরুত্বও বুঝিয়ে বলা হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায় মাত্র ৩০০টি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে। বাদ বাকী প্রতিষ্ঠানগুলো এ নোটিশের কোন তোয়াক্কা করেনি।[৫২] ঢাকার হাজারীবাগের অপরিশোধিত শিল্পবর্জ্য শোধনের কোন ব্যবস্থা নেই। এই এলাকার শিল্প প্রতিষ্ঠানে ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের সুপারিশ থাকলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি।[৫৩]

শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিবেশগত ছাড়পত্রের প্রয়োজন হয়। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন '৯৫ এর ১২ ধারায় এ ব্যাপারে বলা হয়েছে, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছ থেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র ছাড়া কোন এলাকায় কোন

শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না। এই আইন ভঙ্গকারী প্রতিষ্ঠানের মালিকদের ৫ বছর কারাদন্ড বা এক লাখ টাকা জরিমানা করা যেতে পারে। আইনে এসব বর্ণিত থাকলেও পরিবেশ অধিদপ্তর জানায়, অনেকেই তা মানেন না। এমনকি অমান্যকারীদের ছাড়পত্র গ্রহণের নোটিশ দেয়া হলেও তা আমলে নেয় না অনেক প্রতিষ্ঠানই। ছাড়পত্র প্রতিবছর নবায়নের নিয়ম রয়েছে। এ নিয়মও মানা হয় না।[৫৪] সিটি কর্পোরেশনের ট্রেড লাইসেন্স ছাড়া কর্পোরেশন এলাকায় কোন কারখানা গড়ে তোলার নিয়ম নেই। দেখা যায়, বহু ক্ষতিকর কারখানা সিটি কর্পোরেশনের ট্রেড লাইসেন্স নিয়েই গড়ে উঠেছে। প্রতি বছর এসব লাইসেন্স নবায়নের সময় পরিদর্শনের নিয়ম থাকলেও বাস্তবে তা ছাড়াই ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন করা হয়।[৫৫]

দেশে মোটরযান অধ্যাদেশ '৮৩ এর আওতায় কালো ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর, বিআরটিএ এবং পুলিশের উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য নয়। যে কারণে মোটরযানের কালো ধোঁয়া আজ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি।[৫৬]

লক্ষ্য করা যায়, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকেও সময়োচিত পদক্ষেপ অনেক ক্ষেত্রে নেয়া হয়নি। পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের মতে, পলিথিন সামগ্রীর (বিশেষ করে পলিথিন ব্যাগ) ক্ষতিকর দিক বিবেচনা না করেই সরকার এগুলো উৎপাদনের অনুমতি দিয়েছে। এমনকি ক্ষতিকর পলিথিন উৎপাদন বন্ধের দাবী উঠলেও সে দাবী বাস্তবায়িত হয়নি।[৫৭] দেশে একটি জাতীয় পরিবেশ কমিটি রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এ কমিটির সভাপতি। কমিটি রাজধানীর পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের জন্য বেশ কিছু কর্মসূচী হাতে নেয়। কিন্তু তা বাস্তবায়নে কোন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়নি।[৫৮] পরিবেশ দূষণ নিরাময়ে সামাজিক দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে কোন কোন ক্ষেত্রে এর বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীরা সংঘবদ্ধ হয়েছে। সংঘবদ্ধ এই চাপের মুখে সরকার এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা পিছিয়ে গেছে। ১৯৯৫ সালে অটোরিকশা ও অটোটেম্পোর নতুন রেজিস্ট্রেশন প্রদান একেবারে বন্ধ করে দেয়ার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু জনৈক অটোরিকশা আমদানীকারক হাইকোর্টে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। অটোরিকশা ও টেম্পোর মালিকগণও এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গড়ে তোলেন সম্মিলিত আন্দোলন।[৫৯] একই কারণে ঢাকার হাজারীবাগ এলাকা থেকে ক্ষতিকর ট্যানারী শিল্প কারখানাগুলো অন্যত্র স্থানান্তর করা সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া বিআরটিসি, বাস মিনিবাস, ট্রাক এবং অটোরিকশা, অটোটেম্পো মালিক সমিতির সংঘবদ্ধতার কারণে আনফিট গাড়ীর বিরুদ্ধেও কোন ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছে না।[৬০] অবশ্য সাম্প্রতিক সময়ে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকার সদিচ্ছার প্রকাশ ঘটিয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন

কার্যকর করার জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা প্রণয়নের পাশাপাশি সীসাযুক্ত পেট্রোল আমদানীর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই সাথে পরিবেশের জন্য কম ক্ষতিকর গ্যাসচালিত গাড়ীর সংখ্যা বাড়ানোর পদক্ষেপও গ্রহণ করেছে সরকার।[৬১]

প্রকৃত পরিস্থিতি ও ব্যবসায়ের দায়িত্ব

ওপরে উল্লেখিত তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শিল্পে অনুন্নত হওয়া সত্বেও বাংলাদেশে ক্ষতিকর মাত্রায় পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। দেশে বনভূমির স্বল্পতার কারণে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে সহজেই। এ অবস্থার মধ্যেও বৃক্ষ নিধন প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। পাশপাশি দেশের বিপুল অসচেতন জনগোষ্ঠিও পরিবেশের ওপর চাপ সৃষ্টি করে চলেছে।

দেশে বড় বড় নগরী, বিশেষ করে রাজধানী ঢাকার পরিবেশ দূষণ পরিস্থিতি খুবই সংকটজনক। ঢাকায় বায়ু দূষণের মাত্রাও উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌছেছে। এছাড়া ঢাকাসহ অন্যান্য প্রধান নগরীর পার্শ্ববর্তী নদ–নদীর পানিও দূষিত হয়ে পড়ায় তা ক্রমেই ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে।

পূর্বে উল্লেখিত তথ্য থেকে আরো দেখা যায়, দেশে বিপুল সংখ্যক শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে দূষণকারী শিল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব শিল্প প্রতিষ্ঠানের ধোঁয়া এবং বর্জ্য বায়ু ও পানি দূষণ করে চলেছে। অসংখ্য ত্রুটি পূর্ণ যানবাহনও সৃষ্টি করছে পরিবেশ দূষণ। এছাড়া সার ও কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং নানাধরণের কঠিন বর্জ্য ও পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

এসব তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণের প্রায় সবগুলো কারণের সাথেই প্রধানত ব্যবসায়িক কর্মকান্ড সম্পৃক্ত। তবে এই সম্পৃক্ততা স্বত্বেও পরিবেশ দূষণের ব্যাপারে ব্যবসায়ের অসচেতনতা, অথবা ক্ষেত্র বিশেষে সচেতনতা সত্বেও দায়িত্ব এড়িয়ে চলার প্রবণতা লক্ষ্যনীয়। পরিবেশ সংরক্ষন আইন ও নিয়মনীতি মেনে চলার ক্ষেত্রেও ব্যবসায়ীদের রয়েছে অনীহা। অবশ্য এ ব্যাপারে যে এককভাবে ব্যবসায়ীরাই দায়ী তা নয়; আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং সরকারের উদাসীনতাও এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবত এ ধরনের উদাসীনতার কারণেই ব্যবসায়ীরা কেবল পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেই বসে থাকছেন না, কখনো কখনো আইন অমান্য করার জন্যও সংঘবদ্ধ হচ্ছেন।

বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণ পরিস্থিতি এবং পরিবেশ সংরক্ষণে ব্যবস্থা গ্রহণের সাথে যুক্ত সামগ্রিক তথ্য থেকে এ পর্যায়ে যে বিষয়গুলো বেরিয়ে আসছে তা হলোঃ

১। বাংলাদেশে ক্ষতিকর মাত্রায় পরিবেশ দূষিত হচ্ছে।
২। ক্ষতিকর ব্যবসায়িক কর্মকান্ড পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ।

৩। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ও নিয়মনীতি মেনে চলার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ব্যবসায়ীর অনীহা রয়েছে।

৪। পরিবেশ সংরক্ষণে ব্যবসায়ের স্বউদ্যোগী কোন ভূমিকা বা অতি সক্রিয় ভূমিকা নেই।

৫। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা সংঘবদ্ধভাবে আইন ও আদেশ নির্দেশ অমান্য করে প্রকারন্তরে পরিবেশ সংরক্ষণের বিপক্ষে কাজ করছেন। অর্থাৎ আত্মরক্ষা কৌশল অবলম্বন করছেন।

৬। পরিবেশ সংরক্ষণে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তৎপর নয়।

৭। প্রায় ক্ষেত্রেই সরকারী গাফিলতি লক্ষ্যনীয়।

৮। দূষণের মানমাত্রা পরিমাপের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি বাংলাদেশে নেই।

৯। বিলম্বে হলেও দেশে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ও বিধিমালা প্রণীত হয়েছে।

পরিবেশ সংরক্ষণের দায়িত্ব এককভাবে ব্যবসায়ের নয়। ব্যবসায়. ভোক্তা এবং সরকারের যৌথ দায় রয়েছে এ ব্যাপারে। তবে পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্বের বিষয়টিই এক্ষেত্রে মূখ্য আলোচ্য। ব্যবসায়ের এই সামাজিক দায় উন্নত এবং অনেক উন্নয়নশীল দেশে স্বীকৃত। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ব্যবসায় এ ব্যাপারে কোন দায় বহন করছে না। এ দায়িত্ব কেবল সরকার এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার উপরই বর্তেছে।

পরিবেশ সংরক্ষণে গৃহীত ব্যবস্থাগুলো দুইভাবে কার্যকর করা যায়ঃ

ক. দূষণ পূর্ব বা দূষণের উৎসে গৃহীত ব্যবস্থা।

খ. দূষণ পরবর্তী গৃহীত ব্যবস্থা।

দূষণপূর্ব বা দূষণের উৎসে গৃহীত ব্যবস্থা হলো পূর্বেই এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে পরিবেশ দূষিত না হয়ে পড়ে। যেমন পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর দুই ষ্ট্রোক বিশিষ্ট ইঞ্জিনের অটোরিকশা রাস্তায় না চালিয়ে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ এড়ানো যায়। আর দূষণ পরবর্তী গৃহীত ব্যবস্থা হলো পরিবেশ দূষিত হবার পর তা রোধ করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ। বাংলাদেশে সরকার বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দূষণ পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।অথচ ব্যবসায়ীরা এ ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করলে দূষণের পূর্বে বা উৎসেই দূষণ অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হতো। অবশ্য শুধুমাত্র দূষণ পূর্ব ব্যবস্থা গ্রহণ করেই পরিবেশ সংরক্ষণ সম্ভব নয়। কেননা এমন অনেক উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং উৎপাদিত পণ্য রয়েছে যা পরিবেশে সব সময় কিছু না কিছু দূষণ ছড়ায় এবং এগুলোকে উৎসে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। সুতরাং দূষণ পূর্ব এবং দূষণ পরবর্তী উভয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই ব্যবসায়ের ভূমিকা রয়েছে।

সামাজিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন প্রয়াস যেমন হাসপাতাল, স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু প্রধানত নিজেদের সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ নিরাময়ে ব্যবসায়ীদের কোন উদ্যোগ নেই। লক্ষ্যনীয় হলো, এখানকার ব্যবসায়ীরা পরিবেশ সংরক্ষণে নিজে থেকে কোন উদ্যোগ তো গ্রহণ করছেনই না, আইনী উদ্যোগেও তারা সাড়া দিচ্ছেন না। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে উল্টো সংঘবদ্ধ হয়ে তারা আইন ও পরিবেশের বিপক্ষে কাজ করে আত্মরক্ষা কৌশল অবলম্বন করছেন। বাংলাদেশে কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের এ ধরণের সংঘবদ্ধতার ঘটনায় অনুমান করা যায়, পরিবেশ দূষণের ভয়াবহতা সম্পর্কে তারা যথেষ্ট সচেতন নন। ফলে এ ব্যাপারে দায়িত্ববোধ তাদের সৃষ্টি হচ্ছে না। অথচ ভোক্তার অধিকার রক্ষা এবং সেইসাথে দীর্ঘ মেয়াদে ব্যবসায়কে টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই পরিবেশ সংরক্ষণে ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি আজ জরুরী। এক্ষেত্রে শুধু আইন মেনে চলাই ব্যবসায়ের দায়িত্ব নয়, নিজে থেকে অতি সক্রিয় হয়ে এই কাজে এগিয়ে আসাও বাঞ্ছনীয়। পরিবেশ সংরক্ষণে চলাই ব্যবসায়ের দায়িত্ব নয়, নিজে থেকে অতি সক্রিয় হয়ে এই কাজে এগিয়ে আসাও বাঞ্ছনীয়। পরিবেশ সংরক্ষণে ব্যয়ের বড় অংশ বহনের দায়ও ব্যবসায়ের নেয়া উচিত। তবে এজন্যে উৎপাদিতপণ্যের দাম বাড়িয়ে এবং শ্রমিকের মজুরী কমিয়ে জনগণের ওপর এ ব্যয়ভার চাপানো প্রত্যাশিত হবে না। কেননা পরিবেশ সংরক্ষণে সরকারী ব্যয়ের অংশ কর প্রদানের মাধ্যমে মূলত জনগণকেই প্রদান করতে হয়। কাজেই ব্যবসায়ের মুনাফার একটি অংশ পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বরাদ্দ রাখাই হবে বর্তমানের প্রয়োজনে ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব।

কতিপয় সুপারিশ

ব্যবসায়ের পাশাপাশি সরকার, রাজনৈতিক দল, প্রচার মাধ্যমসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মিলিত প্রয়াস ছাড়া পরিবেশ দূষণ রোধ করা সম্ভব নয়। এসব দিক লক্ষ্য রেখে সার্বিকভাবে দেশে পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কতিপয় সুপারিশ তুলে ধরা গেলঃ

১. পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং তার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ করতে হবে। ব্যবসায়ীদেরকেও আইন ও বিধিমালার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।

২. পরিবেশ দূষণের ভয়াবহতা সম্পর্কে গণ সচেতনতা বৃদ্ধি, বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ জোরদার করা প্রয়োজন। শিল্প ও বণিক সমিতিগুলো এ ব্যাপারে সেমিনার ও আলোচনা সভা আহ্বান করতে পারে। রেডিও, টিভি এবং সংবাদপত্রেরও এ ব্যাপারে ভূমিকা রয়েছে। এসব গণমাধ্যমে প্রচারের ব্যয়ের একটি অংশ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বহন করা উচিত।

৩. সিটি কর্পোরেশন কৃর্তক ট্রেড লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন এবং প্রতি বছর লাইসেন্স নবায়নের আগে পরিদর্শনের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ করা জরুরী।

৪. প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক করার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রতি বছর তা নবায়নের সময় পরিদর্শনের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৫. আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজন এবং পরিদর্শকগণ যাতে তাদের কর্তব্যে অবহেলা করতে না পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

৬. পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর শিল্প কারখানায় অপরিশোধিত শিল্প বর্জ্য শোধন করার জন্য বর্জ্য শোধন প্লান্ট স্থাপনের পর পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র প্রদান বা নবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

৭. কঠিন বর্জ্যকে পুনঃ প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে নতুন পণ্যে রূপান্তর করে দুষণ এড়ানো সম্ভব। পৃথিবীর অনেক দেশেই এই পদ্ধতি ব্যবহার করে পরিবেশ দুষণের মাত্রা কমিয়ে আনা হচ্ছে। বাংলাদেশেও পুনঃ প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্প স্থাপন করে পরিবেশ সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

৮. ঘনবসতি এলাকায় শিল্প কারখানা স্থাপনের অনুমতি প্রদান বন্ধ করতে হবে। যেসব ঘনবসতি এলাকায় ক্ষতিকর শিল্প কারখানা রয়েছে সেগুলোকে অবিলম্বে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থাও গ্রহণ করা উচিত। বিষয়টি যাতে রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত না হয়, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সকল রাজনৈতিক দলের সেদিকে লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব রয়েছে।

৯. পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর, এমন ব্যাপারে ব্যবসায়িক সংঘবদ্ধতার বিরুদ্ধে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গ্রহণ বাঞ্ছণীয়।

১০. শিল্প স্থাপনা এলাকায় বৃক্ষ রোপণ এবং দেশে বনভূমির পরিমাণ বৃদ্ধিতে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এতে ক্ষতিকর কার্বন ডাই অক্সাইডের শোষণ ক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব।

১১. পলিথিন ব্যাগ ও ক্ষতিকর পলিথিন সামগ্রীর উৎপাদন অবিলম্বে বন্ধ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার রোধ এবং আর্সেনিক দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সেচ কাজে গভীর নলকূপের পানির ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনার ব্যবস্থা নিতে হবে। এসব ব্যাপারেও রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা রয়েছে।

১২. সীসামুক্ত জ্বালানী তেল আমদানী, দুই ষ্ট্রোক বিশিষ্ট ইঞ্জিনের গাড়ী পর্যায়ক্রমে উঠিয়ে নেয়া, গ্যাস চালিত গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্যোগ দ্রুততর করা এবং প্রচলিত জ্বালানীর ওপর নির্ভরতা কমিয়ে সৌর–চুল্লির ব্যবহার বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩. দূষণের মানমাত্রা নিরূপনের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানীর উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরী।

১৪. পরিবেশ সংরক্ষণে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

১৫. এককভাবে পরিবেশ সংরক্ষণ সম্ভব নয়। এজন্যে পরিবেশ সংরক্ষনে আঞ্চলিক এবং ভূমণ্ডলীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১৬. পরিবেশ সংরক্ষনের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। সরকার এই অর্থ প্রাপ্তির জন্য ব্যবসায়ের ওপর পরিবেশ সংরক্ষণ কর আরোপ করতে পারে। সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির জন্য অবচয় (depreciation) নির্ধারণের মত ব্যবসায় পরিবেশ সংরক্ষণে এ ধরনের তহবিল গড়ে তুলে সরকারকে সহযোগিতা করতে পারে।

ব্যবসায়ের একক প্রচেষ্টায় পরিবেশ সংরক্ষণ সম্ভব নয় বলেই ওপরের সুপারিশমালা সামগ্রীকভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে সুপারিশগুলোর বাস্তবায়নের প্রতিটি পর্যায়েই রয়েছে ব্যবসায়ের দায়িত্ব। যেমন সুপারিশ অনুযায়ী সরকার পরিবেশ সংরক্ষনে আইন প্রণয়ন ও তা কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করলেও ব্যবসায় সে আইন মেনে না চললে সরকারী উদ্যোগ সফল হবে না। কাজেই পরিবেশ সংরক্ষণে সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর করণীয় উল্লেখ করে যেসব সুপারিশ করা হয়েছে তার প্রতিটির সাথেই সম্পৃক্ত রয়েছে ব্যবসায়ের দায়িত্ব। এছাড়া পরিবেশ সংরক্ষনে রাজনৈতিক উদ্যোগ, নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, বৃক্ষরোপণ অভিযান, আঞ্চলিক ও ভূমণ্ডলীয় উদ্যোগ ইত্যাদি সুপারিশমালার ক্ষেত্রেও ব্যবসায় সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করে তার সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে পারে।

উপসংহার

নিজেদের ব্যবসায় টিকিয়ে রাখা ও তার শ্রীবৃদ্ধির স্বার্থেই বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের পরিবেশ সংরক্ষণের মত সামাজিক দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসা উচিত। তবে একথাও ঠিক যে, সার্বিকভাবে পরিবেশ সংরক্ষনে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের একক উদ্যোগ তেমন কোন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে না। এক্ষেত্রে সরকার উদ্যোগী ভূমিকা নিয়ে পরিবেশ সংরক্ষনে করণীয় নির্ধারণের জন্য ব্যবসায়ী রাজনৈতিক দল, বেসরকারী সংস্থা, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন এবং বিশেষজ্ঞসহ সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে একত্র করতে পারে। অবশ্য সার্বিকভাবে পরিবেশ সংরক্ষণে এ ধরনের উদ্যোগই যথেষ্ট নয়, কেননা পরিবেশ দুষনের যে সব কারণের কথা দীর্ঘদিন ধরে উচ্চারিত হচ্ছে, স্থানীয়ভাবে তা দূর করা প্রায় অসম্ভব। দুষণের কোন রাষ্ট্রীয় সীমানা নেই। শিল্পোন্নত দেশগুলো কর্তৃক সৃষ্ট দুষণের দায়ভার এজন্যে অনেকটাই প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র দেশগুলোকে বহন করতে হয়। পরিবেশের ব্যাপারে সর্বাধিক উচ্চকণ্ঠ উন্নত বিশ্বের দেশগুলো তৃতীয় বিশ্বের সামুদ্রিক জলসীমায় মারাত্মক পারমাণবিক ও রাসায়নিক বর্জ্য প্রায়শই নিক্ষেপ করে।[৬২] এ ধরণের মানবতা বিরোধী তৎপরতার শিকার বাংলাদেশের মত গরীব দেশগুলো। এজন্যে বাংলাদেশের মত দেশের পরিবেশ সংরক্ষণে দেশী ব্যবসায়ী ও সরকারের উদ্যোগের পাশাপাশি উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর সরকার ও ব্যবসায়ীদের দায়বদ্ধতার ব্যাপারটি সংগত কারণেই এসে যায়। মূলত বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে পরিবেশ সংরক্ষণের দায় একক বা আঞ্চলিক নয়, এ দায় ভূমণ্ডলীয়।

তথ্য নির্দেশ ও টীকা

১. সৈয়দ রাশিদুল হাসান, "ভোক্তা ও পরিবেশ" *দৈনিক সংবাদ*, ঢাকা, এপ্রিল ২২, ১৯৯৭।

২. "শীতের দেশে অনেক সময় কাঁচের ঘরে শাক-সব্জি জন্মান হয় তাপমাত্রা একটু বেশী পাবার জন্য। এই ঘরগুলোই গ্রীনহাউস। আর গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়া হলো কাঁচের ঘরের মতই পৃথিবীটা গরম হয়ে ওঠা। আলঙ্কারিক অর্থে নামটি এখন ব্যবহৃত হয়।" দ্রষ্টব্যঃ জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস, "গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়া নিয়ে কিছু কথা।" *দৈনিক সংবাদ*, ঢাকা, ডিসেম্বর ১২,১৯৯৬।

৩. সৈয়দ রাশিদুল হাসান, *পূর্বোক্ত।*

৪. ব্যবসায় বলতে মানুষের জীবনধারণ এবং জীবনের মানোন্নয়নের জন্য পণ্য ও সেবা প্রদানের সাথে যুক্ত সকল বাণিজ্যিক এবং শিল্প সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড বোঝায়। দ্রষ্টব্যঃ Raymond E Clos., Richard D. Steade & James R. Lowry, *Business - its Nature and Environment: An Introduction*, South-Western Publishing Co. Cincinnati, 1980, P. 4.

৫. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস, *পূর্বোক্ত।*

৬. *দৈনিক সংবাদ*, ঢাকা, এপ্রিল ২২, ১৯৯৭।

৭. সৈয়দ রাশিদুল হাসান, *পূর্বোক্ত।*

৮. John R Kimberly., *Organization Environment Relationships*, Edited by Janet M. Kraegel, The Management Anthology Series, Nursing Resources, INC., U.S.A, 1980, p. 75.

৯. John M Ivancevich. Herbert L. Lyon & David P. Adams, *Business in a Dynamic Environment*, West Publishing Co., New York, 1979, p. 149.

১০. ibid., 150, 151. pp.

১১. Raymond E Glos., Richard D. Steade & James R Lowry, *op.cit*, p. 29.

১২. *U.S. Environmental Protection Agency, National Emissions Report*, U.S.A., May, 1976, p. 1.

১৩. *U.S. Council on Environmental Quality: The 7th Annual Report*, Washington D.C., U.S. Government Printing Office, 1976, p. 257

১৪. *দৈনিক সংবাদ*, ঢাকা, এপ্রিল ২৫, ১৯৯৭।

১৫. Invancevich, John M. Herbert L. Lyon & David P. Adams, *op. cit.*, p. 152.

১৬. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস, *পূর্বোক্ত।*

১৭. *ঐ*।

১৮. *ঐ*।

১৯. *দৈনিক সংবাদ*, ঢাকা এপ্রিল ২৫, ১৯৯৭।

২০ John M Ivancevich. Herbert L. Lyon & David P. Adams, *op. cit.* pp. 131, 133.

২১. আহমদ, নাসির, "ব্যবসায় এবং সামাজিক দায়িত্ব" *দৈনিক সংবাদ*", ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১৪, ১৯৯৩।

২২. *ঐ*।

২৩. John M. Ivancevich, Herbert L. Lyon & David P. Adams, *op. cit.*, p. 154.

২৪. নাসির আহমদ, *পূর্বোক্ত।*

২৫. *ঐ।*

২৬. John M. Ivancevich, Herbert. L. Lyon & David P. Adams, *op, cit.*, P. 133.

২৭. সৈয়দ রাশিদুল হাসান, *পূর্বোক্ত*

২৮ *পরিবেশ বিষয়ক টাস্কফোর্স প্রতিবেদন*, পরিবেশ অধিদপ্তর, বন ও পরিবেশ মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ১৯৯৪।

২৯. *দৈনিক সংবাদ*, ঢাকা, এপ্রিল ২৬. ১৯৯৭।

৩০. *দৈনিক সোনালী* সংবাদ, রাজশাহী, এপ্রিল ২২. ১৯৯৭।

৩১, *দৈনিক সংবাদ*, ঢাকা, এপ্রিল ২৫, ১৯৯৭।

৩২. *ঐ।*

৩৩. *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ঢাকা, এপ্রিল ২৫, ১৯৯৭।

৩৪. সৈয়দ রাশিদুল হাসান, *পূর্বোক্ত*।

৩৫. *পরিবেশ বিষয়ক টাস্কফোর্স প্রতিবেদন পূর্বোক্ত*।

৩৬. *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ঢাকা, জানুয়ারী ৫, ১৯৯৭।

৩৭. ভূগর্ভের পানির মাত্রাতিরিক্ত উত্তোলনের ফলে ভূগর্ভে যে অক্সিজেন প্রবেশ করে তা পাইরেট নামক পাথরের সাথে মিশে আর্সেনিক বিষ ক বিযুক্ত করে দেয়। দ্রষ্টব্যঃ *দৈনিক ভোরের কাগজ* (ভারতীয় বিশেষজ্ঞ দীপঙ্কর চক্রবর্তীর অভিমত), ঢাকা, জানুয়ারী ১, ১৯৯৭।

৩৮. *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ঢাকা, জুলাই ৩০, ১৯৯৭।

৩৯. শর্মিষ্ঠা সাহা, "ব্যাপক বায়ু দূষণের কবলে বাংলাদেশ", *দৈনিক সংবাদ*", ঢাকা আগষ্ট ১০, ১৯৯৭।

৪০. সৈয়দ রাশিদুল হাসান , *পূর্বোক্ত*।

৪১. *দৈনিক সংবাদ*, ঢাকা, এপ্রিল ২৫, ১৯৯৯৭।

৪২. *ঐ।*

৪৩. *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ঢাকা, জানুয়ারী ৫, ১৯৯৭।

৪৪. *ঐ।*

৪৫. *ঐ।*

৪৬. *দৈনিক সংবাদ*, ঢাকা, এপ্রিল ৪, ১৯৯৭।

৪৭. *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ঢাকা, মে ২৫, ১৯৯৭।

৪৮. *ঐ।*

৪৯. *দৈনিক সংবাদ*, ঢাকা, এপ্রিল ২৬, ১৯৯৭।

৫০. *ঐ.* এপ্রিল ২২, ১৯৯৭।

৫১. *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ৭, ১৯৯৭।

৫২. *ঐ.* মে ২৫, ১৯৯৭।

৫৩. *দৈনিক সংবাদ*, ঢাকা, এপ্রিল ২৬, ১৯৯৭।

৫৪. *ঐ।*

৫৫. *ঐ।*

৫৬. দেশে মোটরযান অধ্যাদেশ '৮৩ এর আওতায় কালো ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর, বি আর টি এ এবং পুলিশের উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য নয়। কালো ধোঁয়া ছড়ানোর অপরাধে মোটর মালিকের কাছ থেকে মাত্র একশ' টাকা জরিমানা আদায়ের বিধান রয়েছে। জীবননাশক কালো ধোঁয়ার বিরুদ্ধে এই আইনটির কোন সংশোধন করা হয়নি। খোদ পরিবেশ অধিদপ্তর থেকেই মোটরযান অধ্যাপদেশ ১৯৮৩ সংশোধন করে জরিমানার পরিমাণ বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে (২৮শে আগষ্ট ১৯৯৭ তারিখে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা কার্যকর হওয়ার পুর্বে)। কিন্তু কোন কাজ হয়নি (দ্রষ্টব্যঃ *দৈনিক সংবাদ,* ঢাকা, এপ্রিল ২৬, ১৯৯৭)। সরকারী উদ্যোগ সত্ত্বেও ক্ষতিকর দুই স্ট্রোক ইঞ্জিনের তিন চাকার অটোরিকশা ও অটোটেম্পোর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। বি আর টি এ এবং ট্রাফিক পুলিশের সমন্বয়হীনতাকেই এজন্যে দায়ী করা হয়। এদিকে রুট পারমিট ছাড়াই অনেক অটোরিকশা ও অটোটেম্পো চালানো হচ্ছে। অভিযোগ আছে, ট্রাফিক পুলিশ এদের মাঝে মধ্যে ধরার পরও রহস্যজনক কারণে ছেড়ে দেয়। (দ্রষ্টব্যঃ *দৈনিক ভোরের কাগজ,* ঢাকা, এপ্রিল ২৫, ১৯৯৭)। নয় বছরের পুরণো অটোরিকশা ও অটোটেম্পো চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। নিষেধাজ্ঞা রয়েছে আনফিট গাড়ী এবং হাইড্রোলিক হর্ণ ব্যবহারকারী গাড়ীর চলাচলের ওপরও। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এসব নিষেধাজ্ঞা কখনোই মানা হয় না। ঢাকা মহানগর সমন্বয় কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত আছে দিনের বেলায় ট্রাকসহ ভারী যানকে নগরীতে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না। কিন্তু এ সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন ঘটেনি (দ্রষ্টব্যঃ *দৈনিক সংবাদ,* ঢাকা, জুলাই ৫, ১৯৯৭)। ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালানার কাজে কালো ধোঁয়া পরিমাপের জন্য স্মোক মিটার, কার্বন মনোক্সাইড পরিমাপের জন্য কার্বন মনোক্সাইড কীটস্ এবং শব্দ পরিমাপের জন্য যে নয়েজ মিটার দেশে ব্যবহার করা হয় তা ত্রুটিপূর্ণ। প্রকৃত দুষণ ক্রিয়া নিরূপনের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি বাংলাদেশে নেই। (*ঐ*)।

৫৭. *দৈনিক ভোরের কাগজ,* ঢাকা, জুলাই ৩০, ১৯৯৭।

৫৮. *দৈনিক সংবাদ, ঢাকা,* জুলাই ৫, ১৯৯৭।

৫৯. *দৈনিক ভোরের কাগজ,* ঢাকা, এপ্রিল ২৫, ১৯৯৭।

৬০. *দৈনিক সংবাদ,* ঢাকা, জুলাই ৫, ১৯৯৭।

৬১. *দৈনিক ভোরের কাগজ,* ঢাকা, মে ২৫, ১৯৯৭।

৬২. সৈয়দ রাশিদুল হাসান, *পূর্বোক্ত*।

রাজশাহী চিনিকল লিমিটেড-এর চিনি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ

মোঃ শামসউদ্দীন *

সারাংশঃ

রাজশাহী চিনিকল লিঃ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থার ব্যবস্থাপনাধীন একটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের ২০ হাজার মেট্রিক টন চিনি উৎপাদন ক্ষমতা রহিয়াছে, কিন্তু ইক্ষু ঘাটতির কারণে পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতা অর্জন করিতে পারে না। যাহার ফলে উৎপাদন খচর বৃদ্ধি পায়। মাড়াই মৌসুমে বিভিন্ন ধরণের গুড় এবং আমদানীকৃত চিনি বাজারে আসার কারণে চিনির বিক্রয় হ্রাস পায়। কৃষকগণ তাহাদের উৎকৃষ্টমানের ইক্ষু মাড়াই কলের মালিকগণের নিকট বিক্রয় করে এবং নিম্নমানের ইক্ষু মিলে সরবরাহ করে ফলে চিনি আহরণ হার কমিয়া যায়। মিলটি এই সকল সমস্যা অতিক্রম করিতে পারিলে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারিবে।

ভূমিকাঃ

চিনি একটি নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী। ইহা পারিবারিক ভোগের জন্য যেমন ব্যবহৃত হইয়া থাকে তেমনি অনেকগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। বেভারেজ, বেকারী এণ্ড কনফেকশনারী, মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারী, ঔষধ প্রস্তুত শিল্প প্রভৃতি শিল্প প্রতিষ্ঠান কাঁচামাল হিসাবে চিনি ব্যবহার করিয়া থাকে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চিনি শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। বাংলাদেশে ইক্ষু একটি প্রধান অর্থকরী ফসল, পাটের পরেই ইহার স্থান। বাংলাদেশের ৪.৫ লক্ষ একর জমিতে ইক্ষু আবাদ হইয়া থাকে।[১] বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থার ব্যবস্থাপনায় ১৪টি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে চিনি উৎপাদন হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া আরও একটি চিনিকল স্থাপনের কাজ শেষ পর্যায়ে রহিয়াছে। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৪ লক্ষ মেট্রিক টন চিনির চাহিদা রহিয়াছে। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা বার্ষিক ২ লক্ষ ৭০ হাজার মেট্রিক টন চিনি উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়।

---

* সহকারী অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষণার উদ্দেশ্যঃ

এই গবেষণার উদ্দেশ্য হইল,

ক) রাজশাহী চিনিকলের চিনি উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের সমস্যা চিহ্নিত করা;

খ) সমস্যার কারণ নির্ধারণ করা এবং

গ) রাজশাহী চিনিকলের চিনি উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের সমস্যাবলীর সমাধানের উপায় নির্দ্দেশ করা।

তথ্য সংগ্রহঃ

এই প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত উপাত্ত সমূহের অধিকাংশ রাজশাহী চিনিকলের দলিল পত্র হইতে সংগৃহীত; কিছু উপাত্ত বিভিন্ন প্রকাশনা হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া চিনিকলের কর্মকর্তা কর্মচারী, উদ্দেশ্যমূলকভাবে নির্বাচিত রাজশাহী চিনিকলে তালিকাভূক্ত ৫ জন চিনির ডিলার এবং ৭ জন ইক্ষু উৎপাদনকারীর সহিত আলোচনা করা হইয়াছে।

গবেষণার আওতা এবং গুরুত্বঃ

রাজশাহী চিনিকলের চিনি উৎপাদন ক্ষমতা এবং উৎপাদনের পরিমাণ বিশ্লেষণ, মিল এলাকায় ইক্ষু উৎপাদন এবং মিলে সরবরাহের পরিমাণ বিশ্লেষণ, চিনির বাজার এবং বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা বিশ্লেষণ এই গবেষণার আওতাভুক্ত।

চিনি শিল্প বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। দেশের কৃষককুলের একটি বৃহৎ অংশ এই শিল্পের সহিত জড়িত। চিনি একটি অতিশয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী। ইহার উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণও অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এই গবেষণাটি এই শিল্পের সমস্যা বিশ্লেষণে এবং সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য কৌশল নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিবে।

পূর্ব গবেষণা সমূহঃ

প্রফেসর মকবুল হোসেন[২] "নর্থ বেঙ্গল চিনিকল লিঃ এবং জয়পুরহাট চিনিকল লিঃ এ ইক্ষু সরবরাহ সমস্যা" শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইক্ষু উৎপাদনকারীগণকে উন্নতমানের ইক্ষুর জন্য উচ্চ মূল্য প্রদান করতঃ ইক্ষু সরবরাহে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। তাঁহার এই প্রতিবেদনে ইহা সুস্পষ্ট যে, সকল মানের ইক্ষুর জন্য একই মূল্য প্রদান চিনিকল সমূহে ইক্ষু সরবরাহ ঘাটতির একটি কারণ। ইক্ষু উৎপাদনকারীগণ অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের ইক্ষু মাড়াই কল মালিকগণের নিকট বিক্রয় করে।

প্রফেসর আজিজুর রহমান[৩] "বাংলাদেশে চিনিকল সমূহের সমস্যাবলী" শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখ করিয়াছেন যে, বাংলাদেশে চিনিকল সমূহের সমস্যা হইল, ইক্ষু সরবরাহ ঘাটতি, জমিতে ইক্ষু উৎপাদন ক্ষমতা কম, ইক্ষু উন্নয়ন সংগঠনের অভাব এবং ইক্ষুর চিনি আহরণ হার কম।

প্রফেসর অভিনয় সাহা[৪] "বাংলাদেশে চিনি শিল্পের দক্ষতা মূল্যায়ন"–শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখ করিয়াছেন যে ইক্ষু উৎপাদনকারীগণকে আকর্ষণীয় মূল্য প্রদান না করার ফলশ্রুতিতে উৎপাদনকারীগণ মাড়াই কল মালিকগণের নিকট ইক্ষু বিক্রয় করিয়া থাকে।

শুভাষচন্দ্র শীল[৫] "রাজশাহী চিনিকলের উৎপাদন খরচ এবং মুনাফা সম্পর্ক"–শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখ করিয়াছেন যে খরচ–মুনাফা সম্পর্কের প্রধান নির্ধারক হইল মিলে উন্নত মানের ইক্ষু সরবরাহ। উন্নতমানের ইক্ষু সরবরাহ না হইলে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ কম হয় এবং উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পায়।

ডঃ আমানুল্লাহ[৬] "চিনি বাজারজাতকরণে মূল্য নির্ধারণ" শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন যে, চিনির মূল্য নির্ধারণে চিনির উৎপাদন খরচ এবং প্রতিযোগিতা বিবেচনা করা হয়।

বাংলাদেশ সরকার চিনি কমিশনের প্রতিবেদনে[৭] চিনি শিল্পকে টিকাইয়া রাখার জন্য উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়াছেন। কমিশন ইক্ষু সরবরাহ করিতে উৎসাহ প্রদান প্রয়োজন বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের বিবরণঃ

১। চিনির উৎপাদনঃ

বাংলাদেশে "বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা'র ব্যবস্থাপনায় ১৪টি চিনিকলে চিনি উৎপাদিত হইয়া থাকে। এই সংস্থার ব্যবস্থাপনাধীন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ বাৎসরিক ২ লক্ষ হইতে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার মেট্রিক টন চিনি উৎপাদন করিতে সক্ষম। রাজশাহী চিনিকল মোট উৎপাদনের শতকরা ৬ ভাগ হইতে ৯ ভাগ চিনি উৎপাদন করিতে পারে। এই মিলের চিনি উৎপাদন ক্ষমতা ২০ হাজার মেট্রিক টন।

ক) রাজশাহী চিনিকলে চিনি উৎপাদনের পরিমানঃ রাজশাহী চিনিকল উৎপাদন ক্ষমতা অর্জন করিতে ব্যর্থ হয়। ১ নং টেবিলে ইহা প্রতীয়মান হয় যে ১৯৯০-৯১ মৌসুম হইতে ১৯৯৪-৯৫ মৌসুম পর্যন্ত ৫ মৌসুমের মধ্যে ১৯৯০-৯১ এবং ১৯৯৪-৯৫ এই দুই মৌসুমে পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতা অর্জন করিতে পারিয়াছে।

রাজশাহী চিনিকল লিঃ

টেবিল নং ১

চিনি উৎপাদন, বিক্রয় ও মজুত (মেট্রিক টন)

মৌসুম	উৎপাদন		উৎপাদন	চিনি আহরণ	বিক্রয়	মজুত
	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত	ক্ষমতা হইতে বিচ্যুতি %	হার (শতকরা)		
১৯৯০-৯১	১৭৫০০.০০	২০২০০.৬০	(+) ১.০০৩	৮.২৩২	২১৬৭০.০০	৩৯৯৭.০০
১৯৯১-৯২	২০০০০.০০	১৩৬৫২.০০	(-) ৩১.৭৪	৮.০৬৭	১৪২৩৩.৩০	৩৪১৬.৩০
১৯৯২-৯৩	১৯০০০.০০	১৩৫৫৪.৪০	(-) ৩২.২৩	৮.১৩৬	১৩৮৫১.৮০	৩১১৮.৯০
১৯৯৩-৯৪	১৮০০০.০০	১৮৫০৫.৫০	(-) ৭.৪১	৭.৯১	১৮০৮১.০০	৩৬২৩.৪০
১৯৯৪-৯৫	২০১৬০.০০	২৩০০৯	(+) ১৫.০০	৭.৮৫	২৩০০৯.০০	৩৬২৩.৪০

উৎসঃ উৎপাদন ও বিক্রয় বিভাগ, রাচিক।

রাজশাহী চিনিকলের উৎপাদন ক্ষমতা অর্জনে ব্যর্থতার মৌলিক কারণ হইল প্রধান কাঁচামাল ইক্ষুর অপর্যাপ্ত সরবরাহ। ইক্ষু উৎপাদনকারীগণ তাহাদের উৎপাদিত ইক্ষু মিল এলাকায় মাড়াইরত ইক্ষু মাড়াইকলে বিক্রয় করিয়া দেয়। প্রত্যেক বছর মিল এলাকায় দেশীয় এবং যান্ত্রিক মাড়াইকল ইক্ষু মাড়াই করিয়া থাকে (টেবিল নং ৩)।

রাজশাহী চিনিকল তাঁহার নিজ এলাকা হইতে ৬০টি ক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে ইক্ষু ক্রয় করিয়া থাকে। রাজশাহী চিনিকলের পূর্ণ ক্ষমতা অর্জন করিতে হইলে মাড়াইকালের বিস্তৃতি ১৭০ দিন হওয়া প্রয়োজন এবং তজ্জন্য ২ লক্ষ ৪৫ হাজার মেট্রিক টন ইক্ষু সরবরাহ প্রয়োজন; কিন্তু মিল প্রয়োজনীয় ইক্ষু সরবরাহ পায়না। ২নং টেবিলে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৯১-৯২, ১৯৯২-৯৩ এবং ১৯৯৩-৯৪ মাড়াই মৌসুমে চিনিকলে ইক্ষু সরবরাহ কম ছিল এবং উৎপাদন ক্ষমতা অর্জন করিতে পারে নাই। ঐ তিন মৌসুমে মিল এলাকায় ইক্ষু উৎপাদনের পরিমানও সন্তোষজনক ছিল। অনুসন্ধানে জানা যায় মিল উৎপাদনকারীগণকে যথাসময়ে ইক্ষুর মূল্য পরিশোধ করিতে

পারে নাই। মিল সকল মানের ইক্ষুর একই মূল্য দেওয়ার কারণে উৎপাদনকারীগণ তাহাদের ভাল মানের ইক্ষু দ্বারা গুড় উৎপাদন করে। ইহা ছাড়া অধিক এবং নগদ মূল্য পাইবার জন্য ভাল মানের ইক্ষু মাড়াইকলে বিক্রয় করে।

রাজশাহী চিনিকল লিঃ (রাচিক)

টেবিল নং ২

ইক্ষু উৎপাদন ও মিলে সরবরাহ (মেট্রিক টন)

মৌসুম	মোট উৎপাদন	মিলে সরবরাহ	মিলে সরবরাহের হার (শতকরা)	ঘাটতি/উদ্বৃত্ত	মাড়াইকাল (দিন)
১৯৯০–৯১	৪৮০৮৪৮.০০	২৪৬৮৮৪.০০	৫১.৩৪৩	(+) ১৮৮৪.০০	১৭০
১৯৯১–৯২	৪৬৪০০০.০০	১৮০০০০.২৫	৩৮.৭৯৩	(–) ৪৪৯৯৯.৭৫	১৪১
১৯৯২–৯৩	৪৪১৪৮৫.০০	১৬৬৫৬৮.২৫	৩৭.৭২৯	(–) ৭৮৪৩১.৭৫	১২২
১৯৯৩–৯৪	৪৪৫৮৮০.০০	২৩৫৯৭৭.৭৩	৫২.৯২	(–) ৯০২২.২৭	১৬২
১৯৯৪–৯৫	৪৪৫৪১২.০০	২৯২৯২৪.৬৮৪	৬০.৩৪	(+) ৪৭৯২৫.০০	১৮৭

উৎসঃ বার্ষিক রিপোর্ট (রাচিক)।

রাজশাহী চিনিকল লিঃ (রাচিক)

টেবিল নং ৩

মাড়াইকলের সংখ্যা

মাড়াইকলের ধরণ	১৯৯০–৯১	১৯৯১–৯২	১৯৯২–৯৩	১৯৯৩–৯৪	১৯৯৪–৯৫
দেশীয় মাড়াই কল	২৫৪২	২৯২৩	১৬১১	২৫০৭	২৩৬০
যান্ত্রিক মাড়াইকল	–	২১১	–	৪৪	৬৫
মোট	২৫৪২	৩১৩৪	১৯১১	২৫৫১	২৪২৫

উৎসঃ রাচিক রেকর্ড

খ) চিনি আহরণ হারঃ বাংলাদেশে ইক্ষুর চিনি আহরণের হার নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি হইতে ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময়কাল পর্যন্ত সর্বাধিক থাকে। ১৯৯৪–৯৫ মাড়াই মৌসুমে মিল সর্বাধিক দিন মাড়াই করিয়াছে কিন্তু উক্ত বৎসরেই চিনি আহরণের হার সর্বাপেক্ষা কম ছিল।

সুতরাং নভেম্বর–ফেব্রুয়ারী সময়কালে অধিক মাড়াই করিতে পারিলে চিনি আহরণের হার বেশী পাওয়া যাইবে।

ইহা ছাড়া মিলে সরবরাহকৃত ইক্ষুর মানের উপরও চিনি আহরণের হার নির্ভর করে। মিল কর্তৃপক্ষ সকল মানের ইক্ষুর একই মূল্য প্রদান করে যাহার ফলে উৎপাদনকারীগণ তাহাদের ভাল মানের ইক্ষু দ্বারা গুড় উৎপাদন করে অথবা সুবিধামত মাড়াইকল মালিকের নিকট বিক্রয় করে।

গ) উৎপাদিত চিনির মানঃ রাজশাহী চিনিকল বাংলাদেশের অন্যান্য চিনিকল অপেক্ষা উন্নতমানের চিনি উৎপাদন করিয়া থাকে। ভারতীয় চিনির মানদন্ড অনুযায়ী এই চিনির মান ২৯ ডি। প্রথম শ্রেণীর চিনিতে ৯৯.৮০% পোল (চিনির বিশেষ উপাদান) থাকা বাঞ্ছনীয়। রাজশাহী চিনিকলে উৎপাদিত চিনিতে ৯৯.৭৫%–৯৯.৭৯% পোল থাকে।

২. চিনির বাজারজাতকরণঃ

ক) চিনির বাজারঃ

বাংলাদেশে বাৎসরিক প্রায় ৪ লক্ষ মেট্রিক টন চিনির চাহিদা রহিয়াছে। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা সর্বোচ্চ ২,৭০,১৩৭.৭৫ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদন করিতে পারে। উদ্বৃত্ত চাহিদা পূরণের জন্য বাংলাদেশ সরকার প্রতি বছর চিনি আমদানী করিয়া থাকে। রাজশাহী চিনিকল দেশীয় বাজারের শতকরা ৫–৬ ভাগ পূরণ করিয়া থাকে।

(১) ভোক্তা/ব্যবহারকারীঃ চিনির ভোক্তা মূলতঃ দুই ধরণের প্রথমতঃ পারিবারিক ভোক্তা, দ্বিতীয়তঃ শিল্প প্রতিষ্ঠান।

পারিবারিক ভোক্তাগণকে দুইভাগে ভাগ করা যায়, প্রথমতঃ শহরবাসী, দ্বিতীয়তঃ গ্রামবাসী। শহরবাসী ভোক্তাগণ চিনির বিকল্প গুড় কম পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকেন (টেবিল ৪–৫); অপরপক্ষে গ্রামীণ ভোক্তাগণ চিনি অপেক্ষা গুড় বেশী ব্যবহার করিয়া থাকেন।

বাংলাদেশে শহরের এবং গ্রামের ভোক্তাগণের মাথাপিছু গড় চিনি ভোগের পরিমাণ যথাক্রমে ২৩০ গ্রাম এবং ৩০ গ্রাম। শহরের এবং গ্রামের ভোক্তাগণের মাথাপিছু গড় গুড় ভোগের পরিমাণ যথাক্রমে ১৬০ গ্রাম এবং ২৫০ গ্রাম।৮

টেবিল নং ৪

চিনি/গুড় খাতে মাথা পিছু ব্যয় (টাকায়)

খাত	১৯৭৩–৭৪		১৯৭৬–৭৭		১৯৮১–৮২	
	গ্রাম	শহর	গ্রাম	শহর	গ্রাম	শহর
চিনি	০.৩১	১.৯০	০.২০	১.৮১	০.৪৪	৪.৫৬
গুড়	১.০৮	০.৬৪	১.০৪	০.৭৪	১.৭৫	১.১০

উৎসঃ বাংলাদেশ পারিবারিক ভোগ ব্যয় জরীপ প্রতিবেদন ১৯৮১–৮২ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৮৬

টেবিল নং ৫

প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা

খাত	১৯৭৩–৭৪		১৯৮১–৮২	
	শহর	গ্রাম	শহর	গ্রাম
চিনি	০.০০৬	০.০১৯	০.০০৫	০.০১৮
গুড়	০.০১৪	০.০০৪	০.০০৯	০.০০২

উৎসঃ বাংলাদেশ পারিবারিক ভোগ ব্যয় জরীপ প্রতিবেদন ১৯৮১–৮২ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৮৬।

দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আছে হোটেল ও রেস্তোরা, বেকারী এণ্ড কনফেকশনারী, মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারী এবং বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানী। এই প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে ঔষধ কোম্পানী ছাড়া অন্য সকলেই কম মূল্যে চিনি কিনিতে আগ্রহী। তাহারা কম মূল্যে ভারতীয় চিনি ক্রয়ে প্রলুব্ধ হয়। যাহার ফলে রাজশাহী চিনিকলের চিনি অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অপরিমাপযোগ্য মূল্য প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়।

(২) প্রতিযোগিতাঃ চোরাপথে আসা চিনি, আমদানীকৃত চিনি এবং গুড় হইল রাজশাহী চিনিকলের চিনির প্রতিযোগী। মিলের মাড়াই মৌসুমে আখের এবং খেজুরের গুড় বাজারে প্রবেশ করে, এই সময়ে আমদানীকৃত চিনিও আসে, চোরাপথে আসা ভারতীয় চিনি সকল সময়ই থাকে। তাই মাড়াই মৌসুমে এই মিলের চিনি বিক্রয়ের পরিমাণ নিম্নতম পর্যায়ে নামিয়া আসে।

খ) চিনির মোড়কী করণঃ চিনি ১০০ কেজি এবং ৫০ কেজি পরিমাণ পাটের বস্তায় মোড়ক জাত করা হয়। ৫০ কেজি ওজনের বস্তার ভিতরের দিকে আর্দ্রতারোধক পলিথিন কাগজ সংযুক্ত থাকে কিন্তু ১০০ কেজি ওজনের বস্তার ভিতর দিকে আর্দ্রতা রোধক থাকে না, যাহার ফলে চিনি গলিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মিলের গুদামঘর পর্যবেক্ষণ সময়ে প্রতীয়মান হয় যে, কিছু সংখ্যক ১০০ কেজি ওজনের বস্তার চিনি গলিয়া গিয়াছে।

গ) উৎপাদন খরচ, মূল্য নির্ধারণ এবং লাভ-লোকসানঃ সংস্থার কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ চিনির মূল্য নির্ধারণ করিয়া থাকে। মূল্য নির্ধারণের জন্য সাধারণতঃ খরচ যোগ মুনাফা পদ্ধতি অনুসরণ করা হইয়া থাকে। তবে কোন কোন বছর প্রতিযোগিতা মোকাবিলা করার জন্য মোট উৎপাদন খরচের নিচেও মূল্য নির্ধারণ করা হইয়া থাকে। ১৯৯১–৯২ এবং ১৯৯২–৯৩ মৌসুমে চিনির মূল্য মোট উৎপাদন খরচের নিচে নির্ধারণ করা হইয়াছিল (টেবিল ৬)। ঐ সময়ে বাজারে কম মূল্যে ভারতীয় চিনি বিক্রয় হওয়ার কারণে এই মিলের চিনি বিক্রয়ের পরিমাণ কমিয়া যায়; তাই বাধ্য হইয়াই কর্তৃপক্ষ চিনির মূল্য হ্রাস করেন।

মিলটি উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী উৎপাদন করিতে পারেনা, যাহার ফলে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পায়। ১৯৯১–৯২, ১৯৯২–৯৩ এবং ১৯৯৩–৯৪ এই তিন বৎসর মিলের পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতা অর্জিত হয় নাই এবং মিল লোকসান মোকাবিলা করিয়াছে (টেবিল ৬)।

রাজশাহী চিনিকল লিঃ

টেবিল নং ৬

উৎপাদন খরচ, বিক্রয় মূল্য এবং লাভ–লোকসান (টাকা/ মেট্রিক টন)

মৌসুম	উৎপাদন খরচ	বিক্রয় মূল্য	লাভ/লোকসান (লক্ষ টাকায়)
১৯৯০–৯১	২২৭৪২.৩০	২৬১১০.০০	২২২.৩৮
১৯৯১–৯২	২৭৮৪৪.৮০	২৫০০০.০০	(৭০৯.০০)
১৯৯২–৯৩	২৮৪৩৮.১৫	২৫০০০.০০	(৯৫৬.২৫)
১৯৯৩–৯৪	২৬৩২৯.৩১	২৮০০০.০০	(২০৪.৮০)
১৯৯৪–৯৫	২৪৬১৪.৫৮	২৮০০.০০	২৩.০৩

উৎসঃ হিসাব বিভাগ, রাচিক
বন্ধনীযুক্ত সংখ্যা লোকসান নির্দেশক।

ঘ) চিনি বিক্রয়ঃ

(১) বিক্রয় খাতঃ রাজশাহী চিনিকলের চিনি বিক্রয়ের ৪টি খাত রহিয়াছে, খাতগুলি হইলঃ

* খাদ্য মন্ত্রণালয়;
* মিলের কর্মকর্তা–কর্মচারী;
* ইক্ষু সরবরাহকারী এবং
* খোলা বাজার।

* **খাদ্য মন্ত্রণালয়ে বিক্রয়ঃ** বাংলাদেশ সরকার, সেনাবাহিনী এবং সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের নিকট রেশনে চিনি সরবরাহের জন্য "বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থার নিকট হইতে চিনি ক্রয় করিয়া থাকে।

মিলের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ইক্ষু সরবরাহকারীগণের নিকট বিক্রয়ঃ চিনিকলের কর্মকর্তা–কর্মচারীগণ প্রতি মাসে ৪ কেজি চিনি নির্ধারিত মূল্যে পাইয়া থাকেন।

ইক্ষু সরবরাহকারীগণের নিকট সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে পূর্জি প্রতি ১২ কেজি চিনি বিক্রয়ের জন্য কুপন প্রদান করে; এই কুপন হস্তান্তরযোগ্য এবং সরবরাহের তারিখ হইতে ৬০দিন পর্যন্ত বৈধ থাকে।

খোলা বাজারে বিক্রয়ঃ চিনি বিক্রয়ের সর্বপ্রধান খাত হইল খোলা বাজার। দেশের সর্বত্র খোলা বাজারে চিনি বিক্রয় হয়। খোলা বাজারে বিক্রয়ের জন্য নিবিড় বন্টন প্রয়োজন। এই নিবিড় বন্টনের জন্য সংস্থা ৩ প্রকার ডিলার নিয়োগ করিয়া থাকে।

ক) পাইকারী ডিলারঃ এই ডিলারগণ সারা দেশে চিনি বন্টন করার জন্য সংস্থা কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত এবং নির্দিষ্ট চিনিকল হইতে চিনি উত্তোলনের অনুমোদন প্রাপ্ত।

খ) স্থানীয় ডিলারঃ এই ডিলারগণ নির্দিষ্ট মিলের স্থানীয় কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সংস্থা কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত।

গ) দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানঃ ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান, বেভারেজ, বেকারী ও কনফেকশনারী, লজেন্স ফ্যাক্টরী ও অন্যান্য চিনি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে সংস্থা নির্দিষ্ট চিনিকলের বিপরীতে তালিকাভুক্ত করিয়া চিনি বরাদ্দের ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

(২) চিনি বিক্রয়ের পরিমাণঃ এই মিলে উৎপাদিত সম্পূর্ণ চিনিই বিক্রয় হইয়া যায় (টেবিল ১)। চিনি বিক্রয় ক্ষেত্রে ঋতুগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়; সাধারণতঃ জুন–অক্টোবর সময়কালে অধিক

পরিমাণ চিনি বিক্রয় হয় (টেবিল ৭)। অনুসন্ধানে জানা যায়, অক্টোবর মাস হইতে বাজারে প্রতিযোগী পণ্য গুড়ের (আঁখের এবং খেজুরের) আমদানী বৃদ্ধি পায়। পারিবারিক ভোক্তাগণের মধ্যে খেজুরের গুড় ক্রয়ের প্রবণতা বাড়ে। ইহা ছাড়া শীত মৌসুমেই আমদানীকৃত বিদেশী চিনির আবির্ভাব ঘটে; সুতরাং চিনির বাজার প্রতিযোগিতাপূর্ণ হইয়া উঠে। এই সময়ে মিলের বিক্রয় হ্রাস পাওয়ায় মিলের নগদ ঘাটতি দেখা দেয় এবং যথা সময়ে ইক্ষুর মূল্য পরিশোধ করিতে পারে নাই।

রাজশাহী চিনিকল লিঃ

টেবিল নং ৭

মাসিক বিক্রয় (১৯৯৪–৯৫)

মাসের নাম	বিক্রয় (মেট্রিক টন)
জুলাই	২০৪০.২০
আগষ্ট	৩৫৫০.৫০
সেপ্টেম্বর	৪০০০.৩৫
অক্টোবর	১৫৪১.৪৩
নভেম্বর	১৩২২.২০
ডিসেম্বর	১২২১.২০
জানুয়ারী	১০৫২.২০
ফেব্রুয়ারী	১০২৭.৮৫
মার্চ	১১২৫.৮৫
এপ্রিল	১৩৭৩.৫২
মে	১৫৫০.৪০
জুন	১৭৯২.০০
সর্বমোট	২১৫৮৮.৫০*

উৎসঃ বিক্রয় বিভাগ, রাচিক।

* খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্মকর্তা/কর্মচারী বাদে।

৩। চিনি উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ সমস্যাসমূহ এবং সমস্যার কারণসমূহঃ

ক) সমস্যাসমূহঃ

মিলটি চিনি উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ ক্ষেত্রে নিম্নেবর্ণিত সমস্যা সমূহের সম্মুখীন হয়ঃ

১) ইক্ষু সরবরাহের অপর্যাপ্ততার কারণে মিল লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করিতে পারে না;

২) নগদ ঘাটতির কারণে ইক্ষু সরবরাহকারীগণকে যথা সময়ে মূল্য পরিশোধ করিতে পারে না;

৩) মাড়াই মৌসুমে মিল চিনি বিক্রয়ে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়;

৪) চোরাপথে আসা ভারতীয় চিনির সহিত অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অপরিমাপযোগ্য প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়;

৫) মিল ১০০ কেজি এবং ৫০ কেজি পরিমাণ পাটের বস্তায় মোড়ক করা হয়। ১০০ কেজির চিনির বস্তার ভিতর দিকে কোন আর্দ্রতারোধক থাকেনা, ফলে বাতাসের সংস্পর্শে আসিলে চিনি গলিতে শুরু করে;

৬) উন্নতমানের ইক্ষু মাড়াই কলে বিক্রয় হওয়ার কারণে মিল নিম্নমানের ইক্ষু পায়, ফলশ্রুতিতে চিনি আহরণের হার কমিয়া যায়।

৭) পূর্ণ ক্ষমতা অর্জন করিতে ব্যর্থ হওয়ায় উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পায় এবং লোকসান মোকাবিলা করিতে হয়।

খ) কারণসমূহঃ

১) প্রাকৃতিক কারণে এবং বৈজ্ঞানিক পন্থায় আবাদ না করার কারণে ইক্ষুর উৎপাদন কম হয় এবং মিলে সরবরাহ কমিয়া যায়।

২) মাড়াই মৌসুমে চিনির বাজার প্রতিযোগিতামূলক হইয়া ওঠে, মিলের চিনি বিক্রয় কমিয়া যায়, যাহার ফলে মিলের নগদ ঘাটতি দেখা দেয় এবং মিল ইক্ষু উৎপাদনকারীগণকে যথাসময়ে নগদ মূল্য পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হয়। সর্বোপরি ইক্ষু উৎপাদনকারীগণ মাড়াইকলে ইক্ষু বিক্রয় করিতে এবং গুড় উৎপাদন করিতে আগ্রহী হইয়া ওঠে।

৩) মিল উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী উৎপাদন করিতে পারে না, তাহাছাড়া যেহেতু মিল সকল মানের ইক্ষুর একই মূল্য প্রদান করে এবং অপরদিকে মাড়াইকল মালিকগণ মান অনুযায়ী ইক্ষুর মূল্য প্রদান করে সেহেতু ইক্ষু উৎপাদনকারীগণ ভাল মানের ইক্ষু মাড়াইকলে বিক্রয় করে এবং নিম্নমানের ইক্ষু মিলে সরবরাহ করে। ইহার ফলে মিলের চিনি আহরণের হার কমিয়া যায়। এই সকল কারণে চিনি উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পায়।

উপসংহারঃ

চিনি শিল্প বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। দেশের কৃষককুলের এক বিরাট অংশ এই শিল্পের সহিত জড়িত। চিনি উৎপাদন দেশের জন্য অপরিহার্য এবং ইহার বাজারজাতকরণও অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশে চিনির ঘাটতি রহিয়াছে, সরকার প্রতি বছর কিছু চিনি আমদানী করার অনুমতি দিয়া থাকেন; এই চিনির আমদানী মাড়াই মৌসুমে নিয়ন্ত্রণ করিলে মিলের জন্য সুবিধাজনক হয়।

চোরাপথে আসা ভারতীয় চিনি বাজারে আসার কারণে মিল অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অপরিমাপযোগ্য প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয় সুতরাং এ ব্যাপারে আইন শৃঙ্খলার কঠোর বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

চিনির মোড়কীকরণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ চিনি বাতাসের জ্বলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে আসিলে ইহা গলিতে থাকে; সুতরাং চিনির বস্তার ভিতরে অবশ্যই আর্দ্রতারোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

ইক্ষু উৎপাদনকারীগণকে যথাসময়ে আকর্ষণীয় মূল্য প্রদান করিয়া; মিলে ইক্ষু সরবরাহ করিতে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

এই সকল সমস্যা সমাধান করিতে পারিলে মিলটি আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারিবে।

পাদটীকা

১। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, *বাংলাদেশ স্টাটিষ্টিক্যাল ইয়ার বুক,* ১৯৯৩।

২। হোসেন এম, "নর্থ বেঙ্গল চিনিকল লিঃ এবং জয়পুরহাট চিনিকল লিঃ এ ইক্ষু সরবরাহ সমস্যা" গবেষণা প্রতিবেদন *বি. এম. ই. টি. প্রজেক্ট,* ইউ জি সি ঢাকা।

৩। রহমান, এ, "বাংলাদেশের চিনি শিল্পের সমস্যা," *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ,* পার্ট–সি, ১৯৮৯।

৪। সাহা, এস, সি, "বাংলাদেশের চিনি শিল্পের দক্ষতা মূল্যায়ন," *বাংলাদেশ ব্যবসায় গবেষণা প্রতিবেদন* ইউ, জি, সি, ঢাকা, ১৯৮৯।

৫। শীল, শুভাষ চন্দ্র, "রাজশাহী চিনিকলের উৎপাদন খরচ–মুনাফা সম্পর্ক," *রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ,* পার্ট–সি, ১৯৯৪।

৬। ডঃ আমানুলাহ্ মুহাঃ "নর্থ বেঙ্গল চিনিকলের চিনি বাজারজাতকরণে মূল্য নির্ধারণ," *রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ,* পার্ট–সি, ১৯৯৪।

৭। বি.এফ.আই.সি. "বাংলাদেশ সুগার কমিশন রিপোর্ট," *ইক্ষু পরিক্রমা,* ১৯৯৫।

৮। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, *বাংলাদেশ পারিবারিক ভোগ ব্যয় জরীপ প্রতিবেদন,* ১৯৮৬।

বিবাহ প্রসংগে যৌতুক

খবির উদ্দীন আহম্মদ*

ভূমিকাঃ

বিবাহ সংক্রান্ত কোন আইনেই যৌতুকের স্বীকৃতি নাই। কিন্তু বিবাহের কোন এক পক্ষ অপর পক্ষ থেকে যৌতুক নেয়। যৌতুক মূলতঃ বিবাহের বর বা কনে কর্তৃক তার পরিবার থেকে গৃহীত অর্থ, সম্পত্তি বা দাবীকৃত বিষয় আশয়। ব্যক্তি ও সামাজিকতার কারণে এটা একটা প্রথারূপে প্রচলিত হয়ে গেছে। সাধারণভাবে বর্তমানে মেয়ে পক্ষ যৌতুক দেয়, ছেলে পক্ষ তা নেয়।

বিবাহ প্রসংগে যৌতুক বাদ দেওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশে যৌতুক নিরোধ আইন প্রচলিত হয়েছে। ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন[১] যৌতুক দেওয়া নেওয়া অবৈধ করেছে। তাছাড়া যৌতুক দাবী করাসহ যৌতুক দেওয়া নেওয়া বা তাতে প্ররোচনা দেওয়াও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।[২]

বিভিন্ন মানবতাবাদী ও নারীবাদী সংগঠন যৌতুককে বিবাহে কেবল মেয়েদের বিরুদ্ধে প্রচলিত প্রথা হিসেবে বিবেচনা করে তা রোধে সচেষ্ট থাকায় যৌতুকের প্রকৃতি ও তার নিরোধ বিষয়ক আইন সম্পর্কে একটি বিশেষ ধারনার প্রসার ঘটেছে। বলা বাহুল্য যৌতুকের সাথে স্বেচ্ছাকৃত দান সামগ্রী, স্ত্রীধন এবং মোহরানা সম্পর্কে পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ধারনার প্রসার তেমন ঘটছে না।

প্রবন্ধটি মোহরানা, স্ত্রীধন ও উপহারসহ যৌতুকের প্রকৃত ধারণা ও অবস্থান আলোকপাত করবে। এছাড়া বিবাহের পক্ষগনের উপর যৌতুক নিরোধ আইনের প্রভাব বিষয়েও নিরপেক্ষ ধ্যান ধারণা তুলে ধরবে।

যৌতুকের সংজ্ঞাঃ

সাধারণ অর্থে যৌতুক হচ্ছে বিবাহকালে বর-কন্যাকে প্রদত্ত ধন।[৩] তবে বাংলাদেশে প্রচলিত মূলতঃ যৌতুকের রূপ অনুযায়ী তার অর্থ হচ্ছে 'বিয়ের সময় বরকে প্রদত্ত অর্থ ও সম্পত্তি।[৪] কেননা সাধারণভাবে বিবাহে কন্যা তথা পাত্রীপক্ষ বর তথা পাত্রপক্ষকে নগদ অর্থ, মূল্যবান সামগ্রী, বাড়ী-জমি, ইত্যাদি দিয়ে থাকে। অবশ্য ক্ষেত্র বিশেষে বিপরীত অবস্থাও হয়ে থাকতে পারে। তবে তা অতি বিরল।

---

* সহকারী অধ্যাপক, আইন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলাদেশে প্রচলিত ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনের যৌতুকের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে বিবাহের এক পক্ষ কর্তৃক বিবাহের অপর পক্ষকে অথবা বিবাহের কোন এক পক্ষের পিতা মাতা বা অপর কোন ব্যক্তি কর্তৃক বিবাহের অপর পক্ষকে বিবাহের সময় বা বিবাহের আগে বা পরে বিবাহের পণস্বরূপ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন সম্পত্তি প্রদান বা প্রদানের সম্মতি জ্ঞাপনকে যৌতুক বলে। মুসলিম বিবাহের দেন মোহর বা মোহরানাকে যৌতুক ধরা হয় না। আবার বিবাহের সময় বিবাহের পক্ষ ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি কর্তৃক বিবাহের কোন পক্ষকে প্রদত্ত অনধিক পাঁচ শত টাকা মূল্যের উপহার সামগ্রীও যৌতুক নয়।

যৌতুকের সংজ্ঞাটি নিম্নরূপঃ

> যৌতুক অর্থ, এ আইনের বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে–
> (ক) বিবাহের এক পক্ষ কর্তৃক বিবাহের অপর পক্ষকে অথবা
> (খ) বিবাহের কোন এক পক্ষের পিতামাতা বা অপর কোন ব্যক্তি কর্তৃক বিবাহের অপর পক্ষকে বিবাহের সময়ে বা বিবাহের আগে বা পরে কোন এক সময়ে কোন সম্পত্তি বা বিষয় সামগ্রী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রদান বা প্রদানের সম্মতি বুঝায়। তবে মুসলিম পারসোনাল 'ল' (শরিয়ত) প্রযোজ্য ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে মোহর বা দেনমোহর বা মোহরানা তার অন্তর্ভুক্ত নয়।
>
> ব্যাখ্যা–সন্দেহ দূর করার জন্য ঘোষনা করা হচ্ছে যে, বিবাহের সময় বিবাহের পক্ষ ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি কর্তৃক বিবাহের কোন পক্ষকে উপহার হিসেবে প্রদত্ত অনধিক পাঁচশত টাকা মূল্যের সামগ্রী এ ধারার অর্থে যৌতুক অনুমিত হবে না যদি না তা পক্ষদের বিবাহের প্রতিদান হিসেবে দেওয়া হয়।[৫]

মিহির লাল সাহা পোদ্দার বনাম ঝুনু রানী সাহা[৬] মামলার যৌতুকের সংজ্ঞায় যে উপাদান থাকার কথা বলা হয়েছে তা হলো, প্রথমতঃ যৌতুক হওয়ার জন্য একে কোন সম্পত্তি হতে হবে, দ্বিতীয়তঃ (১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনের ২ ধারার) (ক) ও (খ) দফায় বর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তা দিয়ে থাকতে হবে বা দেওয়ার জন্য সম্পত্তি প্রদান করে থাকতে হবে, তৃতীয়তঃ বিবাহের সময় বা বিবাহের আগে বা পরে তা দিয়ে থাকতে হবে বা দেওয়ার জন্য সম্মতি প্রদান করে থাকতে হবে, এবং শেষতঃ পক্ষদের বিবাহ সংশ্লিষ্ট হতে হবে।

যৌতুকের সংজ্ঞার বিষয়টি অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণে যে কোন দাবীকে যৌতুক বহির্ভূত করে দেওয়া না যায় সেজন্য *রেজাউল করিম* বনাম *রাষ্ট্র* মামলায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ বলেছেন স্ত্রীকে তার পিতার বাড়ী থেকে স্বামীর নিজ বাড়ী নিয়ে যাওয়ার জন্য বিয়ের পরের স্বামীর নগদ টাকার দাবী যৌতুক নিরোধ আইনের ২ ধারার সংজ্ঞার আওতাভূক্ত না হলেও তা যৌতুক।[৭]

অবশ্য অপর একটি মামলায় নির্ধারণ হয়েছে যেখানে বিবাহের অনেককাল পরে এবং বিবাহের বিনিময় হিসেবে যৌতুক দাবী করা হয় না, ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনের ২ ধারার যৌতুকের সংজ্ঞায় তা যৌতুক নয়।[৮] সম্প্রতি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ *আবুল বাশার হাওলাদার,* বনাম *রাষ্ট্র*[৯] মামলায় যৌতুকের সংজ্ঞায় অপরাধ সংঘটনে নিম্নলিখিত ৪টি উপাদান থাকা আবশ্যক বলেছেনঃ

১। যৌতুক হবে কোন সম্পত্তি বা দানকৃত বিষয় সামগ্রী।
২। তা বিবাহের কোন এক পক্ষ কর্তৃক অপর পক্ষকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রদান বা প্রদানে সম্পত্তি জ্ঞাপন করে থাকতে হবে।
৩। তা বিবাহের সময় বা তার পূর্বে অথবা পরে প্রদান বা প্রদানের সম্মতি জ্ঞাপন করে থাকতে হবে।
৪। তা অবশ্যই বিবাহ সংশ্লিষ্ট হতে হবে।

নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন,১৯৯৫ যৌতুকের সংজ্ঞায় ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনের 'যৌতুক' সংজ্ঞা সমভাবে গ্রহণ করেছে।[১০] *অজিত কুমার প্রামানিক বনাম বকুল রাণী প্রামানিক*[১১] মামলায় যৌতুকের অর্থে বলা হয়েছে বিবাহে বা তার পূর্বে অর্থ, ইত্যাদি প্রদানের সম্মতিই কেবল নয় বরং সম্পাদিত বিবাহ চুক্তি বলবৎ থাকাকালে নতুনভাবে দাবীকৃত অর্থ বা সম্মতিও যৌতুক।

যৌতুকের উৎপত্তিঃ

বিভিন্ন গবেষণা থেকে দেখা যায় যৌতুক প্রথা প্রচলিত হিন্দু সমাজ থেকে মুসলিম সমাজে বিস্তার লাভ করেছে। হিন্দু মেয়েরা পিতার সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পায়না বলে বিবাহে তাদেরকে পণ দেওয়া হয়। কালক্রমে এ নিয়মটিই যৌতুক প্রথা হিসেবে চালু হয়ে গেছে।[১২] হিন্দু সমাজে যৌতুকের উৎপত্তি সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে "তৎকালীন হিন্দু সমাজ থেকে এই যৌতুক প্রথা প্রচলিত হয়ে আসছে। হিন্দু ঘরের মেয়েরা উত্তরাধিকার সূত্রে পিতৃগৃহ থেকে কোন কিছু লাভ করতে পারে না। সে কারণে বিয়ের সময় পিতৃগৃহ থেকে সাধ্যানুসারে যৌতুক দিয়ে থাকে। এই সামাজিক কুপ্রথা ক্রমান্বয়ে মুসলমান সমাজে সম্প্রসারিত হয়েছে।[১৩]

আমাদের সমাজে যৌতুক প্রথার উৎপত্তি বিষয়ে উপরোক্তরূপ কারণ দেখা যায়। তবে বর্তমানে বিবাহের মাধ্যমে যৌতুক গ্রহণ এবং তার দ্বারা সম্পদ অর্জনের পাত্র বা ঐ পক্ষের বাসনা এবং তার বাস্তবায়ন যে ঐ প্রথার উৎপত্তি ও প্রসারের একটি বিশেষ কারণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বর্তমানের যৌতুকের প্রকৃতিতে তার সমর্থন দেখা যায়। তার কারণ বর্তমানের যৌতুকের ঘটনাতে স্বেচ্ছায় দানের বিষয়টি অনেকখানি এবং কোথাও কোথাও পুরোপুরি অনুপস্থিত।

যৌতুকের বর্তমানকালের কারণগুলিকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্বিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[১৪] বলা হয়েছে সম্পদের লোভ এবং ধনী হওয়ার তীব্র আকাংখা এর অন্যতম কারণ। এটা পাওয়ার আকাংখার অন্তর্ভুক্ত। দেওয়ার মাধ্যমে নিজের অর্থ প্রাচুর্য প্রকাশের অভিলাষও একটি বিশেষ কারণ। ধনাঢ্য, আভিজাত্য অবস্থার প্রকাশ ঘটে তার মাধ্যমে। প্রচুর অর্থ সম্পদ দিয়ে মেয়ের বিয়ে দেওয়া এর অন্তর্ভুক্ত। এ দেওয়ার বিষয়টি অবশ্য স্বেচ্ছা প্রণোদিত, স্বেচ্ছাকৃত। অনেকেই একে এ কারণে যৌতুকের শ্রেণীতে রাখতে চায়না। তাদের মতে নেওয়াতে যেখানে বল প্রয়োগ তাই যৌতুক। দেশে প্রচলিত যৌতুক নিরোধ আইন অবশ্য দেওয়া ও নেওয়াকেই এর অন্তর্ভুক্ত রেখেছে।

যৌতুক নিরোধ আইনঃ

বাংলাদেশে যৌতুক নিরোধে দুটি আইন কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। যথাঃ

(১) ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন এবং

(২) নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯৫।

১৯৮৩ সালের নারী নির্যাতন (নিবর্তন মূলক শাস্তি) অধ্যাদেশ[১৫] নারী নির্যাতনে নিবারনমূলক শাস্তির জন্য প্রণীত হয়েছিল। নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯৫ তাকে রহিত করেছে। বাংলাদেশে যৌতুক নিরোধ আইন কার্যকর হওয়ার পূর্বে ভারত ও পাকিস্তানে ঐ প্রকারের আইন প্রচলিত হয়। এ অঞ্চলে সর্ব প্রথম ভারতে যৌতুক বিরোধী আইন The Dowry Prohibition Act, 1961[১৬] পাস হয়। এ আইনটির আদলে বাংলাদেশে ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন পাস হয়। বাংলাদেশের মত ভারতের ঐ আইন যৌতুক বন্ধ করার জন্য প্রনীত। তাতে যৌতুক দেওয়া, নেওয়া, দাবী করাকে অপরাধ ঘোষনা করা হয়েছে। ১৯৭৬ সালে পাকিস্তানেও প্রায় অনুরূপ একটি আইন The Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976[১৭] পাস হয়।[১৮] বাংলাদেশের ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনের যৌতুকের সংজ্ঞায় ভারতের The Dowry Prohibition Act এর সংজ্ঞার মত একই উপাদান বিদ্যমান।

যৌতুক সম্পর্কিত অপরাধঃ

বাংলাদেশে যৌতুক কেন্দ্রীক কিছু আচরণ অপরাধ। যৌতুক নিরোধে প্রচলিত আইন ঐ আচরণগুলিকে অপরাধ হিসেবে শাস্তিযোগ্য করেছে। ঐ শাস্তিযোগ্য অপরাধগুলোর জন্য মামলা দায়ের করা যায়। যৌতুক দেওয়া, নেওয়া, দাবী করা; তা দেওয়া বা নেওয়াতে প্ররোচনা দেওয়া; তার জন্য মৃত্যু ঘটানো বা তার চেষ্টা করা ও গুরুতর আহত করা যৌতুক সম্পর্কিত আইনে অপরাধ। এ অপরাধের প্রকৃত ধারণা সংশ্লিষ্ট আইনের অধীনে নিম্নে আলোচিত হলো।

১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনঃ

যৌতুক নিরোধকল্পে প্রণীত ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন যৌতুক দেওয়া ও নেওয়াকে নিরুৎসাহিত করনের মাধ্যমে বিবাহের একটি উপাদান হওয়া থেকে যৌতুককে বাদ দিয়েছে। আইনটি যৌতুক দেওয়া বা নেওয়া বা তার দাবীকে শাস্তিযোগ্য করেছে। তার জন্য অনধিক এক বছর থেকে সর্বাধিক পাঁচ বছর পর্যন্ত জেল বা জরিমানা অথবা জেল ও জরিমানা হতে পারে।

যৌতুক দেওয়া বা নেওয়াঃ যৌতুক দেওয়া বা নেওয়া প্রসংগে এ আইনে নিম্নরূপ বিধান করা হয়েছেঃ

> যদি কোন ব্যক্তি, এ আইন কার্যকর হওয়ার পর, যৌতুক দেওয়া অথবা নেওয়াকে প্ররোচিত করে অথবা যৌতুক দেয় অথবা নেয় তবে তিনি অনধিক এক বছর থেকে সর্বাধিক পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদন্ডে দন্ডনীয় অথবা অর্থ দন্ডে দন্ডনীয় অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হবেন।[১৯]

> যৌতুক দাবীঃ যৌতুক দাবীর বিরুদ্ধে এ আইনের। ভূমিকা অত্যন্ত স্পষ্ট। বলা হয়েছেঃ
> যদি কোন ব্যক্তি এ আইন কার্যকর হওয়ার পর, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, বর বা কনে বা পিতামাতা বা অভিভাবকের কাছে, যেরূপ হয়, কোন যৌতুক দাবী করে তবে তিনি অনধিক এক বছর থেকে সর্বাধিক পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদন্ডে দন্ডনীয় অথবা অর্থদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হবেন।[২০]

যৌতুক দাবীর শাস্তির এ নিয়ম বর বা কনের পিতামাতা বা অভিভাবকের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যৌতুক দাবীকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে। বিবাহ হয়ে যাওয়ার পরবর্তীকালীন যৌতুক দাবীও এ নিয়মানুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ।[২১] *আবুল বাশার হাওলাদার* বনাম রাষ্ট্র[২২] মামলায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ স্থির করেছেন যৌতুকের বিষয়ে পূর্ববর্তী কোন চুক্তি না থাকা সত্বেও যদি বিবাহ হয়ে যাওয়ার পর যৌতুকের নতুন দাবী করা হয় এবং যৌতুকের এ বিষয়টি ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনের ২ ধারার সংজ্ঞার সাথে সম্পূর্ণরূপে একরূপ নাও হয় তবুও তা এ আইনের ৪ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

আবুল বাশার হাওলাদার বনাম রাষ্ট্র[২৩] যৌতুক বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য মামলা। এর নজীর যৌতুকের সংজ্ঞায় নতুন ধারনা সংযোজন করেছে। মোসাম্মাৎ ফিরোজা বেগম তার স্বামী, শ্বশুর ও দেবরের বিরুদ্ধে ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন এর ৪ ধারায় যৌতুক দাবীর অভিযোগ এনে বলে ৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ তার বিবাহ হয়। বিবাহের সময় তার পিতা-মাতা ১৬,৮০০ টাকার সাংসারিক জিনিসপত্র ও গহনা দেয়। বিবাহের কিছুদিন পর তার পিতার কাছে বন্ধক রাখা কিছু জমি ছেড়ে দেওয়ার জন্য তার স্বামী তার উপর চাপ প্রয়োগ করে। এপ্রিল ৮, ১৯৯০ তারিখে

পুনরায় তার স্বামী একটা দোকান করার জন্য তার কাছে ১০,০০০ টাকা দাবী করে। এ দাবী সে মেনে নিতে অস্বীকার করলে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তাকে গালমন্দ করে। তার প্রতিবাদে অভিযুক্তরা তার অলংকারাদি নিজেদের কাছে রেখে দিয়ে কিল ঘুষি মেরে তাকে বাড়ী থেকে বের করে দেয়। এ অভিযোগে কেবল তার স্বামীর বিরুদ্ধে ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনের ৪ ধারায় অভিযোগ গঠিত হয় এবং বিচারে তার ২ বছর সশ্রম কারাদন্ড হয়। ১ম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতের দেওয়া এ দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে তার স্বামীর দায়ের করা আপীল অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত নামঞ্জুর করেন। এর বিরুদ্ধের ফৌজদারী রিভিশন হাই কোর্ট বিভাগ সরাসরি খারিজ করে দিলে তার স্বামী আপীল বিভাগে যায়। কিন্তু এখানেও তা নামঞ্জুর হয় এবং দন্ডের আদেশ ও রায় বহাল থাকে। এ মামলার অভিযোগের বর্ণনা ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনের ২ ধারার সংজ্ঞার উপাদান সমৃদ্ধ না হওয়া সত্বেও ঐ অভিযোগে দন্ডাদেশ চলে কিনা মর্মে আপীল বিভাগে মামলাটির বিচার হয়। আদালত তাঁর রায়ে যৌতুকের সংজ্ঞার সাথে হুবহু মিল না থাকা সত্বেও যৌতুকের দাবীটিকে অপরাধ গন্য করেন।

নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯৫ঃ

যৌতুকের কারণে নারীকে হত্যা করা বা তার চেষ্টা করা বা তাকে তার জন্য গুরুতর আহত তরা বিষয়ক অপরাধ এ আইনের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশে প্রচলিত এ আইনটি নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাপর ঘৃন্য অপরাধের সংগে যৌতুক সম্পর্কিত এ অপরাধগুলিকে শাস্তিযোগ্য করেছে।

যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানো ইত্যাদির শাস্তিঃ এ প্রসংগে আইনের সংশ্লিষ্ট অংশ নিম্নরূপঃ

(১) যদি কোন নারীর স্বামী, স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা স্বামীর পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি যৌতুকের জন্য উক্ত নারীর মৃত্যু ঘটান, তাহা হইলে উক্ত স্বামী, পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(২) যদি কোন নারীর স্বামী, স্বামীর পিতা,মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা স্বামীর পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি যৌতুকের জন্য উক্ত নারীর মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত স্বামী, পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।[২৪]

যৌতুকের জন্য গুরুতর আহত করার শাস্তিঃ এ প্রসংগে সংশ্লিষ্ট অংশ নিম্নরূপঃ

যদি কোন নারীর স্বামী, স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা স্বামীর পক্ষে কোন ব্যক্তি যৌতুকের জন্য উক্ত নারীকে গুরতর আহত করেন, তাহা হইলে উক্ত স্বামী, পিতা, মাতা,

> অভিভাবক, আত্মীয় বা ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা ১৪ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে যাহা ৫ বৎসরের কম হইবে না, দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবে।[২৫]

নারী নির্যাতন (নিবর্তনমূলক শাস্তি) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ঃ

যৌতুক সম্পর্কিত নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের অন্তর্ভুক্ত অপরাধগুলি এ অধ্যাদেশ এর অধীনে ছিল। ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের[২৬] আওতায় বিশেষ আদালতে অপরাধগুলির বিচার হতো। এ অধ্যাদেশ এর ৬ ধারায় যৌতুকের জন্য নারীর মৃত্যু বা তার চেষ্টা বা গুরুতর আহত বিষয়ক অপরাধ শাস্তিযোগ্য ছিল। নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯৫ এর ১০ ও ১১ ধারায় তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অধ্যাদেশটি রহিত হলেও তার অব্যবহিত পূর্বে তার অপরাধের বিচারাধীন মামলা এবং ঐ প্রকারের মামলায় প্রদত্ত আদেশ, রায় বা শাস্তির বিরুদ্ধে আপীল এমনভাবে পরিচালিত ও নিষ্পত্তি হবে যেন অধ্যাদেশটি রহিত হয়নি। তাছাড়া যেসব অপরাধের জন্য চার্জশীট হয়েছে বা মামলার এজাহার হয়েছে সেগুলোও বিচারাধীন মামলা হিসেবে পরিগণিত হবে।[২৭]

যৌতুকের জন্য মৃত্যু, ইত্যাদি শাস্তিঃ এ প্রংসগে অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট অংশ নিম্নরূপঃ

> যদি কেহ, কোন নারীর স্বামী অথবা স্বামীর পিতা-মাতা, অভিভাবক অথবা আত্মীয় হিসেবে যৌতুকের জন্য ঐ নারীর মৃত্যু ঘটান বা নারীকে গুরুতর আহত করেন বা তার মৃত্যু ঘটানোর বা গুরুতর আহত করার চেষ্টা করেন তবে তিনি মৃত্যুদন্ডে অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন অথবা সর্বাধিক ১৪ বছর সশ্রম কারাদন্ডে এবং অর্থে দন্ডে দন্ডনীয় হবেন।
>
> ব্যাখ্যা-এ ধারায় যৌতুক অর্থ স্ত্রী বা তার পিতা, মাতা, অভিভাবক অথবা অন্য কোন আত্মীয়ের কাছ থেকে বিবাহের প্রতিদান হিসেবে দাবীকৃত কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানত, তবে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন (শরিয়ত) প্রযোজ্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে মোহরানা বা দেন মোহর নয়।[২৮]

অধ্যাদেশের এ ধারাটি যৌতুকের জন্য সাধারণ আঘাত বা তার চেষ্টাকে শাস্তিযোগ্য করে না। এ ধারায় চার্জশীটদাখিল হয়ে যাওয়া *ডাঃ আতিকুর রহমান* বনাম *রাষ্ট্র*[২৯] মামলায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ এ সিদ্ধান্ত দেন।

মামলা দায়েরের স্থানঃ

যৌতুক দেওয়া নেওয়া বা তার দাবীর বিরুদ্ধে ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা দায়ের করতে হয়। যৌতুকের জন্য মৃত্যু, মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা বা যৌতুকের জন্য গুরুতর আহত করার বিষয়ে থানায় এজাহার দেওয়া লাগে। তার উপর ভিত্তি করে সাব ইন্সপেক্টর পদ মর্যাদার নীচে নয় এমন পুলিশ কর্মকর্তার লিখিত রিপোর্টের ভিত্তিতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ আদালতে এ মামলা বিচারের জন্য গৃহীত হয়। অবশ্য অভিযোগকারী যদি আদালতকে সন্তুষ্ট করতে পারেন যে

অনুরোধ করেও তিনি ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তিকে রিপোর্ট দায়ের করাতে ব্যর্থ হয়েছেন, আদালত সরাসরি অভিযোগ বিচারের জন্য গ্রহণ করতে পারেন।

বিচারের স্থানঃ

যৌতুক নিরোধ আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধের বিচারের জন্য নির্দিষ্ট আদালত আছে। যৌতুক দেওয়া নেওয়া বা তাতে প্ররোচনা দেওয়াসহ তার দাবী সম্পর্কিত অপরাধের বিচার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে হয়।[৩০] যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা অথবা যৌতুকের জন্য গুরুতর আহত বিষয়ক মামলার বিচারের জন্য আদালত হচ্ছে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ আদালত। জেলা ও দায়রা জজ সমন্বয়ে তা গঠিত। অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজও বিশেষ আদালতের বিচারক নিযুক্ত হতে পারেন।[৩১]

মামলায় তামাদীঃ

১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনের যৌতুক সম্পর্কিত মামলা ফৌজদারী প্রকৃতির। এ প্রকারের মামলা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দায়েরের জন্য বলা হয়েছে। ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ঐ নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মামলা দায়ের করা না হলে যৌতুক দেওয়া বা নেওয়া বা তাতে প্ররোচনা দেওয়া বা যৌতুক দাবী করার বিরুদ্ধে মামলা চলবেনা। আদালত কর্তৃক মামলা বিচারার্থে গ্রহণ বিষয়ে এ প্রসংগে বলা হয়েছে, 'অপরাধ সংঘটনের তারিখের এক বছরের মধ্যে অভিযোগ দায়ের করা না হলে আদালত এ মামলা আমলে নিবেন না।'[৩২] অবশ্য নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯৫ এর অধীন অপরাধ বিষয়ে এরূপ তামাদীর নির্দিষ্ট সময় সীমা নাই।

জামিনঃ

যৌতুকের অপরাধ জামিন অযোগ্য। ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন এবং নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯৫ যৌতুকের অপরাধকে জামিন অযোগ্য করেছে। অধুনা বিলুপ্ত নারী নির্যাতন (নিবর্তনমূলক শাস্তি) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ তেও যৌতুকের অপরাধ জামিন অযোগ্য ছিল। এ কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তি অধিকার বলে জামিনের দাবী করতে পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জামিন নামঞ্জুর হয়। সন্তোষজনক ও গ্রহণযোগ্য কারনের ভিত্তিতে জামিন মঞ্জুর হতে পারে। ১৯৮৩ সালের নারী নির্যাতন (নিবর্তনমূলক শাস্তি) অধ্যাদেশের ৬ ধারায় আনীত একটি মামলায়[৩৩] আদালত এজাহারকারিনীর উপর স্বামীর আঘাতকে গুরুতর আঘাতের চিহ্ন না ধরে এবং অভিযুক্তর দীর্ঘকাল হাজতবাসকে বিবেচনা করে জামিন মঞ্জুর করেন। নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯৫ 'নারী ও শিশু নির্যাতন সম্পর্কিত কতিপয় ঘৃন্য

অপরাধের জন্য বিশেষ বিধান।' আইনটি জামিন বিষয়ক প্রচলিত নিয়মে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এ আইনের অধীন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি (আসামী) মামলার তদন্ত চলাকালে জামিনে মুক্ত থাকতে পারে না। এ আইনে মামলার তদন্তের সাথে জামিনের বিষয়টি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। এ সম্পর্কিত প্রাসংগিক অংশ নিম্নরূপঃ

অপরাধের তদন্তঃ–(১) এ আইনের অধীনে অপরাধের তদন্ত কাজ অপরাধটি সংঘটনের রির্পোট প্রাপ্তি অথবা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক অপরাধ তদন্তের আদেশ প্রদানের ৬০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি বিশেষ কারণ প্রদর্শন করিয়া আদালতকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন যে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে তদন্তের সময়সীমা বৃদ্ধি করা সমীচিন, তাহা হইলে আদালত তদন্তের নির্ধারিত সময়সীমা ৩০ দিন বর্ধিত করিতে পারিবে।

(২) যেক্ষেত্রে উপ–ধারা (১) এ নির্ধারিত ও বর্ধিত সময়সীমা অতিক্রান্তের পর আদালত কোন আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বা অন্য কোন কারণে, এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে কোন অপরাধের উপর আরও তদন্ত হওয়া সমীচীন ও প্রয়োজন সেইক্ষেত্রে আদালত, অভিযুক্ত ব্যক্তির জামিন ও অন্যান্য বিষয়ে তৎকর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ সাপেক্ষে অতিরিক্ত সময়ের জন্য তদন্তের নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৩) উপ–ধারা (১) এর নির্ধারিত তদন্তের সময়সীমা পর্যন্ত আসামীদের জামিন মঞ্জুর করা যাইবে না।

(৪) যেক্ষেত্রে উপ–ধারা (১) এ নির্ধারিত বর্ধিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তদন্ত সম্পন্ন না হয়, সেই ক্ষেত্রে আদালত আসামীকে জামিনে মুক্তি দিতে পারিবে এবং জামিন মঞ্জুর না করা হইলে সেই জন্য কারণ লিপিবদ্ধ করিবে।[৩৪]

জামিন সম্পর্কে এ আইনের অপর প্রাসংগিক অংশ নিম্নরূপঃ

এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, অভিযুক্ত বা শাস্তিযোগ্য কোন ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইবেনা, যদি–

(ক) তাহাকে মুক্তি দেওয়ার আবেদনের উপর অভিযোগকারী পক্ষকে শুনানীর সুযোগ দেওয়া না হয়, এবং

(খ) তাহার বিরুদ্ধে অনীত অভিযোগ তিনি দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় যুক্তি সংগত কারণ রহিয়াছে মর্মে আদালত সন্তুষ্ট হন।[৩৫]

সাধারণতঃ গুরুত অপরাধের ক্ষেত্রে জামিন অযোগ্যতা নীতি বাংলাদেশে প্রচলিত এবং ঐ নিরিখে যৌতুক বিষয়ক অপরাধকেও গুরুতর গন্য করা হয়েছে। অপরাধটিকে মূলতঃ সামাজিকভাবে নিরুৎসাহিত করনের লক্ষ্যে জামিন অযোগ্য করা হয়েছে।

মুসলিম বিবাহঃ

মুসলিম বিবাহ একটি চুক্তিগত সম্পর্ক। একপক্ষ কর্তৃক বিবাহের প্রস্তাব এবং অপর পক্ষ কর্তৃক তা কবুলের মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। বিবাহের এটাই নুন্যতম প্রয়োজনীয়তা। অনেক সময়ই এ ছাড়া অন্য কিছু বিষয়কে বিবাহের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান বলা হয়, কিন্তু দেখা যায় ঐগুলির অনুপস্থিতি বিবাহ চুক্তিকে অবৈধ করেনা। ছেলেমেয়ের বিবাহের বয়স মুসলিম আইনে এক রমক আছে। তাতে নাবালক নাবালিকার বিবাহের চুক্তি হওয়ারও সুযোগ আছে। তা অবৈধ নয়। কিন্তু দেশের সাধারণ আইনে এ বাল্য বিবাহ বন্ধ করার জন্য ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়ে ও ২১ বছরের কম বয়সী ছেলের বিবাহকে শাস্তিযোগ্য করা হয়েছে। মুসলিম বিবাহে স্ত্রী অধিকারগত ভাবে মোহরানা পেয়ে থাকে। তাকে বিবাহের প্রতিদানও বলা হয়।

মোহরানা এবং যৌতুকঃ

মুসলিম বিবাহে স্বামীর কাছ থেকে বিবাহের প্রতিদান হিসেবে স্ত্রী যে সম্পত্তি বা অর্থ পায় তাকেই দেনমোহর তথা মোহরানা বলে।[৩৬] বিবাহের সময় বা তার আগে বা পরে মোহরানা ধার্য করা যায়। এর পরিমান স্বামী ইচ্ছা করলে বাড়াতে পারে কিন্তু কমাতে পারে না; অবশ্য স্ত্রী কমাতে এবং মাফও করে দিতে পারে। এজন্য কোন প্রতিদানের প্রয়োজন হয়না।[৩৭] মোহরানা অবশ্যই পরিশোধ করতে হয়। মোহরানা পরিশোধ করা না হলে তা আদায়ের জন্য মামলা করা যায়। বৈবাহিক সম্পর্ক থাকাকালেই মোহরানার প্রমন্ট অংশ তথা চাহিবা মাত্র পরিশোধযোগ্য অংশ আদায়ের জন্য মামলা করা চলে। এক্ষেত্রে মামলার সময় মোহরানা চাওয়া এবং তা প্রত্যাখানের তারিখ থেকে তিন বছর। বিবাহ বিচ্ছেদ বা মৃত্যুর দ্বারা বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার তিন বছরের মধ্যে ডেফারড্ অংশের জন্য মামলা করতে হয়। অন্যথায় মামলা তামাদী হবে।[৩৮] এ মোহরানাকে যৌতুক নিরোধ আইনে যৌতুক হিসেবে গণ্য করা হয়নি। বিবাহের বিনিময়ে বিবাহের প্রতিদান হিসেবে মেয়ে কর্তৃক মোহরানা গ্রহণ অনুমোদিত। ফলে এতে যৌতুকের কোন চরিত্র প্রতিফলিত হয়না।

হিন্দু বিবাহঃ

হিন্দু বিবাহকে কোন চুক্তি হিসেবে দেখা হয়না; বরং তাকে ধর্মীয় সংস্কার তথা স্যাক্রামেন্ট বলা হয়[৩৯] যা ধর্মীয় কর্তব্য প্রতিপালনের পবিত্র বন্ধন।[৪০] বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রী স্বামীর নিয়ন্ত্রনে চলে যায়।[৪১] এ বিবাহ নারী ও পুরুষের মধ্যে বিচ্ছেদ অযোগ্য একটি আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলে।[৪২] হিন্দু বিবাহে অনেকগুলো প্রয়োজনীয় উপাদান বিদ্যমান। ঐগুলি অনুসরনের কঠোরতা অনেকক্ষেত্রে দেখা গেলেও শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে শিথিল হয়ে পড়েছে।

হিন্দু বিবাহে প্রতিদান এবং যৌতুকঃ

হিন্দু দর্শনে বিবাহের মাধ্যমে কন্যা সম্প্রদান করা হয়। এতে সে পিতৃ পরিবার থেকে স্বামী পরিবারে স্থানান্তরিত হয় এবং স্বামীর সাথে একটি অবিচ্ছেদ্য আত্মায় রূপান্তরিত হয়। বিবাহের সময় বরাবরই স্বেচ্ছায় উপহার ও দান সামগ্রী যথা অর্থ, সম্পদ, উপঢৌকন, ইত্যাদি কন্যাকে দেওয়া হয়। বিবাহে প্রদত্ত ঐ সম্পত্তিও যৌতুক হিসেবে গন্য হয়।[৪৩] উত্তরাধিকার আইনে হিন্দু মেয়ে তার পিতৃ পরিবার থেকে সম্পত্তি পায়না। এ কারণেও বিবাহে তার পিতৃ পরিবার যৌতুক প্রদান করে। অবশ্য পাত্র পক্ষ বিবাহের বিনিময়ে ধন সম্পদ অর্জনের লক্ষ্যে পাত্রী পরিবার থেকে যৌতুক আদায় করে। বিবাহে পাত্রী পরিবার কর্তৃক স্বেচ্ছায় প্রদত্ত দান সামগ্রীকে যৌতুকের আওতায় অনেকেই আনতে চায়না। পাত্র পক্ষের দাবীকৃত এবং তার মাধ্যমে আদায়কৃত ও আদায়যোগ্য অর্থ ও মূল্যবান সামগ্রীকে যৌতুক হিসেবে আখ্যায়িত করে।

মোহরানা বনাম স্ত্রীধনঃ

মেয়েদের নিজস্ব সম্পত্তির বিশেষ উৎস মুসলমানের ক্ষেত্রে মোহরানা এবং হিন্দুর ক্ষেত্রে স্ত্রীধন। বিবাহের বিনিময়ে তার প্রতিদান হিসেবে স্বামীর কাছ থেকে মুসলমান স্ত্রী মোহরানা পায়। হিন্দু মেয়েদের বিভিন্নভাবেই 'স্ত্রীধন' সম্পত্তি অর্জিত হয়। তবে বিবাহের বিনিময়ে তারা মুসলমানের মত স্বামীর কাছ থেকে আধিকার বলে কোন সম্পত্তি পায়না। মোহরানা যৌতুক নয়; কিন্তু বিবাহের সময়ের দান সামগ্রীর স্ত্রীধন যৌতুক।

উপসংহারঃ

যৌতুক মানবতা বিরোধী অপরাধ। ব্যক্তি, সমাজসহ সকল স্তর থেকে তার প্রভাব দূর করা প্রয়োজন। এ লক্ষে অবশ্য এ উপ-মহাদেশে যৌতুক নিরোধ আইন কার্যকর আছে। বাংলাদেশে ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন এবং নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯৫ সেজন্য প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু তার ব্যবহারিক দিক যৌতুক নিরোধে ভূমিকা রাখলেও একটি শ্রেণী তার শিকার হচ্ছে। আইন প্রণয়নের মহৎ উদ্দেশ্য তাতে ব্যাহত হতে পারে। ফলে নিম্নবর্ণিত অবস্থাগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়ঃ

(১) নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯৫ নারী ও শিশু নির্যাতন সম্পর্কিত কতিপয় ঘৃন্য অপরাধের বিরুদ্ধে প্রণীত হওয়ায় তার অন্তর্ভুক্ত যৌতুক সম্পর্কিত অপরাধ কেবল নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়। নারীর স্বামী, স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা তার (স্বামী) পক্ষের কোন ব্যক্তি এজন্য শাস্তি পেতে পারে। এ আইন কেবল স্বামীর বিরুদ্ধে ব্যবহার্য।
এ আইন ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনের 'যৌতুক' এর সংজ্ঞা গ্রহণ করলেও নারীর বিরুদ্ধে কোন অপরাধ হতে পারে বলেনি।

(২) ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনের ৩ ধারায় অভিযোগ আনা যায় না। কারণ কারো বিরুদ্ধে যৌতুক নেওয়ার অভিযোগ আনা হলে তাতে দেওয়ার বিষয়টি পক্ষান্তরে স্বীকার করে নেওয়া হয় যা ঐ ধারার আধীনে অপরাধ। দোষ স্বীকারের মাধ্যমে অপরাধ সংঘটন থেকে বাঁচার জন্য যৌতুক দেওয়ার পরও কারো বিরুদ্ধে যৌতুক নেওয়ার অভিযোগ না এনে ঐ আইনের ৪ ধারায় তা দাবীর অভিযোগ করা হয়।

(৩) ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনের মামলায় তামাদীর নিয়ম প্রযোজ্য।

(৪) আইন দুটির অপরাধ জামিন অযোগ্য। ফলে সাধারণ ভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তি জামিন পেতে পারে না।

এ সাধারণ নিয়মের বাইরেও নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯৫ এর অপরাধের তদন্তকালে আসামীকে জামিনে মুক্তি দেওয়া যায় না। জামিন বিহীনকাল এটা। মামলা রুজু হওয়াতেই আপনা আপনি আসামীর আটকাদেশ হয়ে যায়। এ অবস্থাতে কেবল কোন নারীর স্বামী, স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা তার (স্বামী) পক্ষের কোন ব্যক্তিকে পড়তে হয়। মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা এবং গুরুতর আহত করার এজাহারে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে যথাক্রমে ১০ ও ১১ ধারায় মামলা হয়। এ আইন বলবৎ হওয়ার পূর্বে ১৯৮৩ সালের নারী নির্যাতন (নিবর্তনমূলক শাস্তি) অধ্যাদেশ প্রচলিত ছিল। অপরাধগুলি এ আইনের ৬ ধারার অধীন ছিল।

যৌতুকের জন্য হত্যার চেষ্টা করা বা গুরুতর আহত করার সাক্ষ্য প্রমান কৃত্রিম পদ্ধতিতে তৈরী করা যেতে পারে। বর্তমানে শৈল্য চিকিৎসা উন্নতির শিখরে। যদি তার সাহায্যে ও আশ্রয়ে দেহে গুরুতর আহত হওয়ার চিহ্ন ফুটানো যায়, মামলার ভালো প্রেক্ষাপট হয়। বিচারের আগেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পদ্ধতিগত কারণে আটক থাকতে হয়।

৫। মোহরানা বিবাহের প্রতিদান। স্বামীর কাছ থেকে তা আদায়ের জন্য পারিবারিক আদালতে মামলা করা যায়। আদালত তা আদায়ে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন। অনাদায়ী মোহরানা আদায়ে স্বামীকে সর্বাধিক তিন মাস কারাদন্ড দেওয়া যায়। বিবাহে মুসলমান পুরুষ এরূপ আইন স্বীকৃতি প্রতিদান পায়না। মোহরানা যৌতুক নয়। অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের যথা হিন্দু বিবাহে যৌতুক নামে বিভিন্ন প্রকার দান সামগ্রী দেওয়া ও নেওয়া হয়। স্ত্রীধনের অন্তর্ভুক্ত এ সম্পত্তির জন্য হিন্দু আইনে পৃথক উত্তরাধিকার নিয়মও বিদ্যমান। ফলে এ সম্পত্তির অস্তিত্ব আইন স্বীকৃত। কিন্তু যৌতুক নিরোধ আইনের সংজ্ঞায় তা যৌতুক।

যৌতুক প্রথা বাংলাদেশে ভয়াবহ রুপ লাভ করেছে। রাষ্ট্র এ প্রথা দুর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করেছে। এতদসত্বেও প্রথাটি চলে আসছে। প্রকৃতভাবে তা দূর করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা প্রয়োজন। যৌতুকের কারনে বিবাহ যাতে ভেংগে না যায় সেজন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখার পাশাপাশি বিবাহের পর যৌতুক দাবী, তার জন্য নির্যাতন ইত্যাদি থেকে বিবাহের সংশ্লিষ্ট পক্ষকে রক্ষার জন্য রাষ্ট্রসহ একযোগে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

তথ্য নির্দেশঃ

১। ১৯৮০ সালের ২৫ নং আইন, বাংলাদেশ গ্রেজেট (এক্সট্রা অর্ডিনারী), ডিসেম্বর ২৬, ১৯৮০।

২। আরো দেখুন *১৯৯৫ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন* (১৯৯৫ সালের ১৮নং আইন)।

৩। *সোনার বাঙলা অভিধান,* তৃতীয় সংস্করণ, (ঢাকাঃ ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ১৩৮২), যৌতুক।

৪। *বাংলা একাডেমী ইংলিশ* – বেঙলী ডিকশনারী (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), ডাউরি।

৫। *১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন,* ধারা ২।

৬। (১৯৮৫) ৩৭ *ডিএল আর* (হাবি) ২২৭।

৭। (১৯৮৯) ৯ *বিএলডি* (হাবি) ৩৫ঃ ৪০ *ডিএলআর* ৩৬০।
এ মামলার বাদিনী মোসাঃ তোসলিমা বেগমের অভিযোগ ছিল তার সাথে রেজাউল করিমের মুসলিম আইন অনুযায়ী বিয়ে হয়। তারপর থেকে তাকে তার স্বামী তার পিতার বাড়ীতে রেখে দেয় এবং সেখানেই তার সাথে স্বামী–স্ত্রী হিসেবে বসবাস করে। ফলে তার এক কন্যা হয়। রেজাউল করিমকে নিজ বাড়ীতে তার স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বললে বিনিময়ে সে ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা দাবী করে এবং ঐ টাকা দিতে অস্বীকার করা হলে বাদিনীর ভাইয়ের উদ্যোগে এ বিষয়ে শালিশ বসে। তাদে ঐ টাকা ছাড়াই বাদিনীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়। কিন্তু তা নিষ্ফল হয়। রেজাউল করিম আর ফিরে আসে না এবং বাদিনী ও কন্যার খোরপোষ দেয় না।

৮। আনোয়ারা বেগম বনাম রাষ্ট্র (১৯৯৩) ১৩ *বিএলডি* (হাবি) ৪৭৩।

৯। (১৯৯৪) ১৪ *বিএলডি* (আবি) ১৮৫।

১০। *নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯৫,* ধারা ২ (চ)।

১১। (১৯৯৪) ১৪ *বিএলডি* (হাবি) ৩৩৫ঃ ৪৬ *ডিএলআর* ২৯০।

১২। মুঈদ খান মামুন, "দি কার্স অফ ডাউরি" *দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট,* জুলাই ৮, ১৯৯৭; গিয়াসুদ্দিন আহমদ, "মেয়েদের উত্তরাধিকারও যৌতুক প্রথা," *দৈনিক ইনকিলাব,* ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৬; মোঃ আলী, "যৌতুক ও তার প্রতিকার," *দৈনিক ইনকিলাব,* মার্চ ১৩, ১৯৯৬; সুফিয়া আহমদ এবং জাহানারা চৌধুরী, "উইমেন্স লিগ্যাল স্টেটাস ইন বাংলাদেশ, *"দি সিচুয়েশন অফ উইমেন ইন বাংলাদেশ ১৯৭৯,* সম্পাদনা উইমেন ফর উইমেন রিসার্চ এ্যান্ড ষ্টাডি গ্রুপ, (ইউনিসেফ, ঢাকাঃ উইমেন্স ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, ১৯৭৯), ৩০৯।

১৩। মোঃ আলী, "যৌতুক ও তার প্রতিকার," *দৈনিক ইনকিলাব,* মার্চ ১৩, ১৯৯৬।

১৪। মুঈদ খান মামুন, "দি কার্স অফ ডাউরি," *দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট,* জুলাই ৮, ১৯৯৭।

১৫। ১৯৮৩ সালের ৬০ নং অধ্যাদেশ।

১৬। ১৯৬১ সালের ২৮ নং আইন।

১৭। ১৯৭৬ সালের ৪৩ নং আইন।

১৮। বিস্তারিত দেখুন আবুল বাশার হাওলাদার বনাম রাষ্ট্র (১৯৯৪) ১৪ *বিএলডি* (আবি) ১৮৫।

১৯। *১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন,* ধারা ৩।

২০। *প্রাগুক্ত,* ধারা ৪।

২১। মোঃ সালাম মল্লিক বনাম রাষ্ট্র (১৯৯৬) ৪৮ *ডিএলআর* ৩২৯।

২২। (১৯৯৪) *১৪ বিএলডি* (আবি) ১৮৫।

২৩। *প্রাগুক্ত*।

২৪। *নারী ও শিশু নির্যাতন আইন*, ধারা ১০।

২৫। *প্রাগুক্ত*, ধারা ১১।

২৬। ১৯৭৪ সালের ১৪ নং আইন।

২৭। *নারী ও শিশু নির্যাতন আইন*, ধারা ২৯ (২) (৩)।

২৮। *নারী নির্যাতন (নিবর্তন মূলক শাস্তি) অধ্যাদেশ*, ১৯৮৩, ধারা ৬।

২৯। (১৯৯৪) *১৪ বিএলডি* (হাবি) ৩০৩।

৩০। *যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০*, ধারা ৭ (ক) (গ)।

৩১। *নারী ও শিশু নির্যাতন আইন*, ধারা ১৬।

৩২। *১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন*, ধারা ৭ (খ)।

৩৩। ডাঃ আতিকুর রহমান বনাম রাষ্ট্র (১৯৯৪) *১৪ বিএলডি* (হাবি) ৩০৩।

৩৪। নারী ও শিশু নির্যাতন আইন, ধারা ১৮।

৩৫। *প্রাগুক্ত*, ধারা ২৬ (২)।

৩৬। নেইল বি,ই, বেঈলী, *এ ডাইজেষ্ট অফ মুহম্মাডান*, ভলিউম ১, (লাহোর ঃ প্রিমিয়ার বুক হাউস, ১৯৫৮), ৯১; আবদুল কাদির বনাম সেলিমা (১৮৮৬) ৮ এলাহাবাদ ১৪৯।

৩৭। জেইনী বেগম বনাম উমরাব বেগম (১৯০৮) ৩২ *বোম্বাই* ৬১২।

৩৮। *১৯০৮ সালের তামাদি আইন*, তফসিল–১, ধারা ১০৩, ১০৪।

৩৯। সুন্দর লাল টি দেসাই, *মুল্লা প্রিন্সিপল্‌স অফ হিন্দু ল*, ১৪ সংস্করণ, (বোম্বেঃ এন, এম, ত্রিপাঠি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৪), ৫০৭।

৪০। সুন্দ্রেবাই বনাম শিব নারায়ন (১৯০৮) ৩২ *বোম্বাই* ৮১।

৪১। এস, কে, রাউথ, *এলিমেন্টস অফ হিন্দু ল*, (ঢাকাঃ আইডিয়াল লাইব্রেরী, ১৯৭৪), ১৯।

৪২। প্রাগুক্ত, ৩১।

৪৩। দেসাই, *প্রাগুক্ত*, ১৯৫।

সামাজিক প্রেক্ষাপটে গ্রামবাংলার নারীশিক্ষার অন্তরায়

শর্মিষ্ঠা রায়*

সার সংক্ষেপঃ

এই প্রবন্ধে বাংলাদেশে নারী শিক্ষার বর্তমান অবস্থা এবং নারী শিক্ষার অনগ্রসরতার পেছনে বিদ্যমান সামাজিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। নারী শিক্ষার প্রসারকল্পে সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচী এবং তৎসম্পর্কিত একটি মূল্যায়ন আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

ভূমিকাঃ

শিক্ষা মানুষের একটি জন্মগত অধিকার। আর মানুষ হিসাবে এই অধিকার ভোগের সুযোগ প্রত্যেক নারীরই কাম্য। সমাজের আর দশজন পুরুষের পাশাপাশি মাথাতুলে দাঁড়াবার, সমাজ, দেশ ও জাতীয় উন্নয়নের শরীক হওয়ার অধিকার রয়েছে প্রতিটি নারীর। আর এই অধিকার অর্জনের একমাত্র পন্থা হলো শিক্ষা। কিন্তু আজো এদেশের নারীরা সেই সুযোগ পুরোপুরি পাচ্ছে না। দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক এবং শ্রমশক্তির অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষা ক্ষেত্রে তারা পুরুষদের তুলনায় অনেকখানি পিছিয়ে রয়েছে। শিক্ষা ছাড়া নারী জাতির উন্নয়ন তথা দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয় বলেই সারাবিশ্ব আজ সোচ্চার। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশও আজ এর যথার্থতা স্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পারছে বলেই আগের তুলনায় এদেশের মেয়েদের শিক্ষার হার কিছুটা বেড়েছে। কিন্তু শিক্ষার মাধ্যমে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠার পথে এখনো পাহাড় প্রমাণ বাধা বিদ্যমান। আলোচ্য প্রবন্ধে গ্রামবাংলায় নারী শিক্ষার অনগ্রসরতার পেছনে বিদ্যমান সামাজিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং নারী শিক্ষার প্রসারকল্পে সরকারী উদ্যোগ এবং তৎসম্পর্কিত মূল্যায়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশে নারীশিক্ষার বর্তমনা অবস্থাঃ

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। দেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১১ কোটি ৯০ লাখ (পরিসংখ্যান পকেট বুক, ১৯৯৫, সংবাদ, ১৯৯৬ঃ১)।পুরুষ ও নারীভেদে এর আনুপাতিক বন্টন ১০৬ঃ১০০ (Statistical Pocket book 1995)। অর্থাৎ সংখ্যার দিক থেকে নারী

---

* প্রভাষক, সমাজকর্ম বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

পুরুষ প্রায় সমান সমান। কিন্তু শিক্ষার দিক থেকে নারীরা পুরুষদের সমকক্ষ নয়। বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার ৩৪%, তন্মধ্যে স্বাক্ষর পুরুষ রয়েছে শতকরা ৪৫ ভাগ এবং স্বাক্ষর মহিলা রয়েছে শতকরা ২৪ ভাগ (উন্নয়ন পদক্ষেপ, ১৯৯৫ঃ৪)। গ্রামবাংলায় এই হার আরো উদ্বেগজনক। পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় ১৯৬১ সালে পাঁচ বৎসর বা তার উর্ধ্বে গ্রামবাংলায় নারী শিক্ষার হার ছিল শতকরা ১৪.৯ ভাগ। ১৯৯১ সালে তা দাঁড়ায় শতকরা ১৬.৭ ভাগে (BBS, 1992:185)। সুতরাং ১৯৬১ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত এই ৩০ বছরে নারীশিক্ষার প্রবৃদ্ধির হার মাত্র শতকরা ১.৮ ভাগ।

গ্রাম বাংলায় নারীশিক্ষার অন্তরায়ঃ

দারিদ্রঃ আমাদের দেশে নারীশিক্ষার প্রধান অন্তরায় হলো দারিদ্র। ১৯৮৯–৯০ সালে খানা আয় তথ্য অনুসারে বাংলাদেশে ৫৫ শতাংশ মানুষ দরিদ্র ছিল (বালা, ১৩৯৭ ঃ ৩৩)। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯১–৯২ সালে আমাদের দেশে জনসংখ্যার শতকরা ৪৯.৭ ভাগ দরিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে (হক, ১৯৯৬ঃ৫৮)। ব্যাপক দারিদ্রের কারণে পিতা–মাতা তাদের সন্তান সন্ততিদের সুষ্ঠুভাবে লেখাপড়া শেখাতে পারে না।। প্রতিদিন দুবেলা দু'মুঠো অন্নের সংস্থান করা যাদের পক্ষে কষ্টকর তাদের পক্ষে সন্তানের লেখাপড়ার খরচ জোগানো আশাতীত (রায়, ১৯৯৪ঃ৭৬, রহমান, ১৯৯৩ঃ৪)। তাদের সাধ আছে অথচ সাধ্য নেই। যাদের একটু সামর্থ আছে তারা পুত্র সন্তানের শিক্ষার প্রতিই বেশী আগ্রহী। কন্যা সন্তানের লেখাপড়ার পেছনে যে ব্যয় তা অধিকাংশ অভিভাবকই অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বলে মনে করেন। কারণ একটা পুত্র সন্তানকে শিক্ষিত করে তুললে ভবিষ্যতে বৃদ্ধ বয়সে সে চাকরী করে অথবা অন্য যে কোন উপায়ে বৃদ্ধ পিতা–মাতার দেখাশুনা করতে পারবে। কিন্তু কন্যা সন্তানটিকে শিক্ষিত বা উচ্চ শিক্ষিত করে তার কাছ থেকে এমনটা আশা করা যায় না। কারণ মেয়ে বড় হলে বিয়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিতে হবে। সুতরাং দরিদ্র পিতা–মাতার পক্ষে পুত্র সন্তানকে শিক্ষা দেওয়াটাই স্বাভাবিক।

কন্যা সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার নেতিবাচক মনোভাবঃ

আমাদের দেশে নারীশিক্ষার পশ্চাদপদতার আরেকটি প্রধান কারণ হলো জন্মলগ্ন হতে কন্যা সন্তানের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব। কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে তার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বেশী মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। গ্রামবাংলায় এখনো লক্ষ্য করা যায় পুত্র সন্তান জন্ম নিলে উচ্চস্বরে আযান দিয়ে পৃথিবীতে তার আগমনকে স্বাগত জানানো হয়। অথচ কন্যা সন্তানের প্রতি ঠিক উল্টো আচরণ। তার কানে আস্তে আস্তে কোরানের আয়াত বা আযানের ধ্বনি শুনানো হয়। এর অর্থ কন্যা সন্তানটি আদর্শ রমনী হিসাবে বেড়ে উঠবে। পর্দানসীন হবে, তার গলার আওয়াজ গৃহের বাইরে পৌঁছাবে না। অর্থাৎ জন্মলগ্ন থেকেই তার গতিবিধির উপর সীমারেখা টেনে দেওয়া হয় (Ahmed, 1981:141, Jennings, 1990:95)। শুধু

মুসলিম পরিবারেই নয় হিন্দু পরিবারেও এই ধরনের মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। অনেক হিন্দু পরিবারে পুত্র সন্তান জন্ম নিলে শাঁখ বাজিয়ে তাকে স্বাগত জানানো হয় (Blanchet, 1984:120)। এই মানসিকতা থেকেই সন্তান প্রতিপালনের প্রতিটি পর্যায়ে অর্থাৎ সন্তানের পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য বন্টন, চিকিৎসা, শিক্ষা সর্বক্ষেত্রে কন্যা সন্তান পুত্র সন্তান অপেক্ষা কম প্রাধান্য পায় (Chaudhury and Ahmed, 1980:12)। পিতা-মাতার নিকট পুত্র সন্তান সম্পদ এবং কন্যা সন্তান বিপদ বা দায় হিসেবে বিবেচিত হয় (বালা, ১৩৯৭ঃ৪২)। নারী জাতির প্রতি এই ধরনের মানসিকতাই আমাদের দেশে বিশেষ করে গ্রামবাংলায় নারী শিক্ষার পশ্চাদপদতার জন্য অনেকাংশে দায়ী।

যৌতুক প্রথা ও বাল্য বিবাহঃ

আমাদের দেশে বিশেষ করে গ্রামবাংলার নারী শিক্ষার পশ্চাদপদতার পেছনে যৌতুক প্রথা ও বাল্য বিবাহ অনেকাংশে দায়ী। এই জঘন্যতম কুপ্রথার কারণে আজ গ্রামবাংলার অনেক মেয়ে তাদের প্রতিভা ও সুপ্ত ক্ষমতা থাকা সত্বেও উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে সংসারের ঘানি টানছে। মেয়েদের উচ্চ শিক্ষিত করে তার উপযুক্ত পাত্রের সাথে বিয়ে দিতে হলে পাত্রের পিতা-মাতার হাতে মোটা অংকের টাকা যৌতুক হিসাবে তুলে দিতে হয়। কারণ আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় অধিকাংশ শিক্ষিত ছেলের পিতা-মাতা মনে করে তাদের ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে অনেক অর্থ ব্যয় হয়েছে। অতএব ছেলের বিয়ে দিয়ে তারা সেই অর্থ উসল করতে চায়। কিন্তু মেয়ে যদি প্রাথমিক জ্ঞান সম্পন্ন হয় তাহলে যেকোন গৃহস্থ ঘর দেখে তাকে বিয়ে দিতে যৌতুক কম লাগে। তাই দরিদ্র পিতা-মাতা আর্থিক লাভ-ক্ষতির হিসাব করেই তাদের কন্যা সন্তানটিকে উচ্চশিক্ষা প্রদান থেকে বিরত থাকেন (Satter, 1982: ৩)। এবং অল্প বয়সেই বিয়ে দিয়ে দেন। যে বয়সে তাদের লেখাপড়া করার কথা সে বয়সে তাদেরকে শ্বশুরবাড়ী যেতে হয়। গ্রামাঞ্চলে সাধারণত ১২-১৫ বৎসর বয়সের মধ্যেই মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয় এবং ১৯ বৎসরের মধ্যেই শতকরা ৭৫ ভাগ মেয়ের বিয়ে হয়ে যায় (Chaudhury and Ahmed, 1980:13, Sarker and Banu, 1990:25)। এই অপ্রাপ্ত বয়সে বিবাহের কারণেই গ্রামবাংলায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ড্রপ আউটের হার অতি উচ্চ (Rahman and Sarker, 1989:15)।

গ্রামাঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় ও মহিলা শিক্ষিকার স্বল্পতাঃ

গ্রামাঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় ও মহিলা শিক্ষিকার স্বল্পতা নারীশিক্ষার অনগ্রসরতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। আমাদের গ্রামবাংলার অধিকাংশ জনগণ অজ্ঞ ও রক্ষণশীল মনের অধিকারী হওয়ায় বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলে-মেয়েদের সহশিক্ষা পছন্দ করেন না (Sarker, 1990:9 Ahmed,

1991:97, Chaudhury and Ahmed, 1980:13)। যার কারণে রক্ষণশীল পরিবারগুলো মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে আগ্রহ প্রকাশ করেন না। শুধু বালিকা বিদ্যালয়ের স্বল্পতাই নয় পাশাপাশি মহিলা শিক্ষিকার স্বল্পতাও নারীশিক্ষার গতিকে অনেকাংশে ব্যাহত করছে। মেয়েরা স্বভাবগত কারণেই লাজুক প্রকৃতির। একজন পুরুষ শিক্ষকের কাছে তারা যতটা না স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দে বিদ্যালাভ করে তদাপেক্ষা একজন মহিলা শিক্ষিকার নিকট তারা বেশী আগ্রহ ও উৎসাহ বোধ করে। তাই গ্রামবাংলায় মহিলা শিক্ষিকার স্বল্পতা নারীশিক্ষা ক্ষেত্রে একটি প্রধান বাধা হিসাবে বিবেচিত। Statistical Year Book 1991 অনুযায়ী ১৯৮৯-৯০ সনে বাংলাদেশে সরকারী পর্যায়ে বালক-বালিকা ভেদে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা নিম্নের সারণীর মাধ্যমে দেখানো হলো

সারণী-১

বালক-বালিকা ভেদে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা

বিদ্যালয়	বিদ্যালয়ের সংখ্যা			শিক্ষকের সংখ্যা		
	বালক (শতকরা হার)	বালিকা (শতকরা হার)	মোট (শতকরা হার)	পুরুষ (শতকরা হার)	মহিলা (শতকরা হার)	মোট (শতকরা হার)
প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৫,৪৮০ (৯৯.৩৪)	৩০৩ (০.৬৬)	৪৫,৭৮৩ (১০০)	১,২৭,৩১৮ (৮০.৫২)	৩০,৭৯৫ (১৯.৪৮)	১,৫৮,১১৩ (১০০)
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৮,৩৪০ (৮৫.৭১)	১,৩৯১ (১৪.২৯)	৯,৭৩১ (১০০)	৪,৩২৩ (৬৭.১১)	২,১১৯ (৩২.৮৯)	৬,৪৪২ (১০০)

স্মারণী নং-১ থেকে লক্ষ্য করা যায় সার্বিকভাবে বাংলাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা অতি নগণ্য। প্রাথমিক পর্যায়ে বালক বিদ্যালয়ের শতকরা হার ৯৯.৩৪ ভাগ এবং বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা শতকরা ০.৬৬ ভাগ। অনুরূপভাবে মাধ্যমিক পর্যায়ে বালক বিদ্যালয় শতকরা ৮৫.৭১ ভাগ, বালিকা বিদ্যালয় শতকরা ১৪.২৯ ভাগ। শুধু বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যাই নগণ্য নয়, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে পুরুষ ও মহিলা ভেদে শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যার ক্ষেত্রেও তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেখানে পুরুষ শিক্ষক রয়েছেন শতকরা ৮০.৫২ ভাগ সেখানে শিক্ষিকা রয়েছেন শতকরা ১৯.৪৮ ভাগ। অনুরূপভাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও পুরুষ শিক্ষক শতকরা ৬৭.১১ ভাগ, শিক্ষিকা শতকরা ৩২.৮৯ ভাগ। গ্রাম পর্যায়ে এ হার আরো উদ্বেগজনক। সম্প্রতি রাজশাহী জেলার পবা থানার

তিনটি ইউনিয়নের উপর সম্পাদিত একটি গবেষণায় লক্ষ্য করা যায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে মোট ২৮টি এবং বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৪টি। মাধ্যমিক পর্যায়ে বিদ্যালয় রয়েছে ৮টি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক ও শিক্ষিকার সংখ্যা এবং তাদের শতকরা হার নিম্নের সারণীর মাধ্যমে দেখানো হলো।

সারণী–২

গবেষণা এলাকায় সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক–শিক্ষিকার সংখ্যা

প্রাথমিক বিদ্যালয়			মাধ্যমিক বিদ্যালয়		
শিক্ষক (শতকরা হার)	শিক্ষিকা (শতকরা হার)	মোট (শতকরা হার)	শিক্ষক (শতকরা হার)	শিক্ষিকা (শতকরা হার)	মোট (শতকরা হার)
১৩৫ (৭৮.৪৮)	৩৭ (২১.৫২)	১৭২ (১০০)	৮৭ (৮৪.৪৬)	১৬ (১৫.৫৪)	১০৩ (১০০)

বিশ্লেষণঃ সারণী – ২ হতে লক্ষ্য করা যায় গবেষণা এলাকায় সরকারী এবং বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের হার শতকরা ৭৮.৪৮ ভাগ এবং শিক্ষিকা শতকরা ২১.৫২ ভাগ। অনুরূপভাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে লক্ষ্য করা যায় শিক্ষক শতকরা ৮৪.৪৬ ভাগ এবং শিক্ষিকা শতকরা ১৫.৫৪ ভাগ (রায়, ১৯৯৪ঃ ৯৭–৯৯)। এ থেকেই অনুমান করা যায় আমাদের দেশে বিশেষ করে গ্রাম পর্যায়ে শিক্ষকের তুলনায় শিক্ষিকার হার খুবই নগণ্য।

অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বাড়ী থেকে বিদ্যালয়ের দূরবর্তী অবস্থানঃ

এটি গ্রামাঞ্চলে নারী শিক্ষার অনগ্রসরতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। গ্রামবাংলায় প্রায় ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় বিদ্যালয়গুলোর অবস্থান বাড়ী থেকে অনেক দূরে। এমন অনেক গ্রাম আছে যে গ্রামে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে কোন বিদ্যালয় নাই। এই সমস্ত গ্রামের ছেলে মেয়েদের এক থেকে দেড় মাইল পর্যন্ত পায়ে হেঁটে বিদ্যালয়ে যেতে হয় (Ahmed 1991:86)। আমাদের দেশে প্রতি ২টি গ্রামের জন্য ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে (সুলতানা, প্রদ্যোত, ১৯৯৩ঃ২১)। গ্রামবাংলায় বিদ্যালয়ের অবস্থান শুধু দুরে নয়, যোগযোগ ব্যবস্থাও অনুন্নত। যার কারণে বর্ষাকালে রাস্তা ঘাট চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এই সময়ে বিদ্যালয়ে ছাত্র–ছাত্রীর উপস্থিতির হার অনেক কম হয়। পরবর্তীতে যখন তারা ক্লাসে আসে তখন পড়া ঠিকমত অনুসরণ করতে পারে না। যার ফলে পড়ার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে তারা চিরতরে বিদ্যালয় ছাড়তে বাধ্য হয়

(Ahmed, 1978: 84) এছাড়াও বিদ্যালয়ের অনুন্নত পরিবেশ, ম্যানেজিং কমিটির উদাসীনতা, রাস্তায় বখাটে ছেলেদের উৎপাত নারী শিক্ষার অনগ্রসরতার জন্য অনেকাংশে দায়ী।

পর্দা প্রথা, রক্ষণশীলতা ও ধর্মীয় সংস্কারঃ

গ্রামবাংলার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পর্দা প্রথা, রক্ষণশীলতা ও ধর্মীয় সংস্কার। এই ব্যবস্থা গ্রামীণ মেয়েদের সামাজিক বিচরণের ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশের গ্রামে ও শহরে মেয়েদের কোন না কোন ভাবে পর্দা মেনে চলতে হয়। তবে গ্রামের তুলনায় শহরে পর্দার প্রভাব কিছুটা কম। পর্দা বলতে শুধুমাত্র বোরখা বা ওড়না ব্যবহার বুঝায় না। এর একটা মনোঃ সামাজিক ও ব্যবহারিক দিক রয়েছে। যাকে আমরা পর্দা মূল্যবোধও বলতে পারি। এই পর্দা মূল্যবোধের কারণে গ্রামীণ মেয়েরা বিশেষ করে মুসলিম পরিবারের মেয়েরা বেশী রক্ষণশীল। যার কারণে গৃহের বাইরে যত্রতত্র বিচরণ বা পরপুরুষের মুখ দেখা তাদের কাছে ধর্মীয় অপরাধ। পর্দার কারণে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালিকা ব্যাতীত সব মহিলাকেই প্রতিবেশী বা নিকট আত্মীয় নির্বিশেষে যে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে জীবনযাপন করতে হয় (Sattar, 1975:44, Jahan, 1975:5)। কোন পরপুরুষের সাথে মেয়েরা আড়াল থেকে কথা বলবে এটাই সামাজিক নিয়ম। যদি এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে তাহলে সমাজে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয় (Mia, 1985:211-227)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই পর্দা প্রথা, রক্ষণশীলতা ও ধর্মীয় সংস্কারই গ্রামাঞ্চলে নারীর চলমান গতিকে রুদ্ধ করে রেখেছে এমন কি শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। (হোসেন, ১৯৯৫:৫৩, Mabud, 1990:19)। যার কারণে গ্রামাঞ্চলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে মেয়েদের ড্রপ আউটের হার বেশী পরিলক্ষিত হয়। ধর্মীয় অনুশাসন এবং পর্দাজনিত মূল্যবোধের কারণে বয়োঃপ্রাপ্ত মেয়েদের ছেলেদের সাথে একই বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করা অনেক অভিভাবক পছন্দ করেন না। ফলে মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের পড়াশুনার ছেদ পড়ে।

সরকারী নারীশিক্ষা কর্মসূচীর মূল্যায়নঃ

শিক্ষা ছাড়া জাতির উন্নয়ন সম্ভব নয় বলেই নারী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে এযাবৎ বেশ কিছু কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। এগুলোর মধ্যে পৌর এলাকার বাইরে মেয়েদের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক, ১৯৯৩ সালে "খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা" কর্মসূচী, প্রতি থানায় ১টি করে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন, ৬ষ্ট থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। নারী শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ করে গ্রাম বাংলায় নারী শিক্ষা সম্প্রসারণের নিমিত্তে সরকার কর্তৃক গৃহীত এই সমস্ত উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসার দাবী রাখে। বিগত দশকগুলির তুলনায় সাম্প্রতিককালে নারী শিক্ষার হার অনেকটা বেড়েছে। শিক্ষার দ্বার উন্মোচন হওয়ার সাথে সাথে নারী ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারী চাকরীতে কর্মকর্তা পর্যায়ে ১০ শতাংশ, কর্মচারী পর্যায়ে

১৫ শতাংশ, প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক পদে ৫০ শতাংশ পদ মহিলা কোটা প্রবর্তন করা হয়েছে (নাসরীন খন্দকার, ১৯৯৫ঃ৩৯)। শিক্ষার মাধ্যমে নারী মুক্তি এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিবিধ উদ্যোগ সত্বেও নারী শিক্ষার হার পুরুষের সমপর্যায়ে এখনো আসতে পারেনি। এর কারণ কর্মসূচী বাস্তবায়নে এখনো যথেষ্ট বাধা বিদ্যমান। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় নারী শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পৌর এলাকার বাইরে মেয়েদের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে (আলমুতী, ১৯৯১ঃ২২)। কিন্তু সরকারের একথা স্মরণ রাখতে হবে বেতন ছাড়াও শিক্ষাক্ষেত্রে আনুসংগিক আরো অনেক খরচ রয়েছে যেমন, বই, কাগজ, কলম, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি। যেগুলোর ব্যয় বহন করা দরিদ্র পিতা-মাতার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। সুতরাং সরকারকে এই দিকটির প্রতি সচেতন দৃষ্টি দিতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষা উপকরণ সমূহের মূল্য হ্রাস করে দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করতে হবে। অনুরূপভাবে "খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা" কর্মসূচী দরিদ্র ও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করে তোলার একটি অন্যতম প্রচেষ্টা। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় এই কর্মসূচী পরিচালনায় যথেষ্ট অসুবিধা রয়েছে। এই কর্মসূচীর আওতায় দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যাদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার শতকরা ৮৫ ভাগ তাদেরকে গম বা চাল বিতরণ করা হবে। শুধু তাই নয় খাদ্য বিতরণের জন্য দরিদ্র পরিবার চিহ্নিত করণের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত একটি নীতিমালা রয়েছে। যেমনঃ দরিদ্র পরিবার বলতে ধরা হবে (১) দুঃস্থ, বিধবা পরিবার, (২) দিন মজুর, (৩) অস্বচ্ছল পেশাধারী যেমন-জেলে, কামার, কুমার, তাঁতী, মুচি ইত্যাদি, (৪) ভূমিহীন অর্থাৎ যাদের ০.৫০ একর পর্যন্ত জমি রয়েছে। অর্থাৎ যাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাবার মত আর্থিক সংগতি নেই (উন্মেষ, ১৯৯৩ঃ৩)। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত এই নীতিমালার বাইরে বেশ কিছু সংখ্যক পরিবার স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি ও মাস্তানদের সহযোগিতায় স্কুল কর্তৃপক্ষের উপর চাপ প্রয়োগ করে এই সুবিধাভোগ করছে। যার ফলে প্রকৃত দুঃস্থ পরিবারগুলো অনেকাংশে তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুযোগ প্রদানে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। শুধু তাই নয় এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ৬১টি জেলার ৪৩৫টি থানার ১টি করে মোট ৪৩৫টি ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি থানার ১টি করে ইউনিয়ন এই কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়েছে। অথচ একটি থানার অধীনে ১০ এরও অধিক ইউনিয়ন থাকে। অবশিষ্ট ইউনিয়নগুলি এই কর্মসূচীর সেবা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

গ্রামবাংলায় নারী শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিগত সরকার ১৯৯৪ সালে দেশের প্রতি থানায় মাধ্যমিক পর্যায়ে ১টি করে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন (সংবাদ, ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪ঃ১)। সরকারের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তবে একটি থানার আয়তন বেশ বড়। পল্লীর দূর-দুরান্ত থেকে মেয়েদের পক্ষে বিদ্যালয়ে আসা অসুবিধাজনক। সুতরাং থানা পর্যায়ে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হলে তা গ্রামীণ নারী শিক্ষা সম্প্রসারণে

সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়। সাম্প্রতিককালে গ্রাম পর্যায়ে যে উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে তাতে যথেষ্ট ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছে। ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে তিনটি আবশ্যকীয় শর্ত রয়েছে। যথাঃ (১) পরীক্ষায় কমপক্ষে ৪৫% নম্বর পেতে হবে। (২) শতকরা ৭৫ দিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে হবে এবং (৩) অবিবাহিতা হতে হবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় এমন অনেক বিদ্যালয় আছে যেখানে মাসের অধিকাংশ দিনই ছাত্রী অনুপস্থিত থাকে। অর্থাৎ বৃত্তি প্রদানের সময় যে সমস্ত ছাত্রীদের দেখানো হয় স্কুলের ক্লাসে সেই পরিমাণ ছাত্রী উপস্থিত থাকে না (ভোরের কাগজ, ২২শে নভেম্বর, ১৯৯৬ঃ৬)। কুড়িগ্রাম জেলার ৭টি থানায় এই প্রকল্পের কাজ ব্যহত হচ্ছে যার নজির পাওয়া যায় ভোরের কাগজে। এই কর্মসূচী পরিচালনার ক্ষেত্রে আরেকটি সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেটি হলো ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদানে ধনীরাও শিক্ষকদের উপর চাপ প্রয়োগ করে উপবৃত্তির ফরম পূরণ করে নিচ্ছে। যার কারণে অসহায় শিক্ষকগণ নিজেদের নিরাপত্তা ও বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে অনিচ্ছা স্বত্বেও কোন না কোন উপায়ে ফরম পূরণ করতে বাধ্য হয় (দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ নভেম্বর, ১৯৯৬ঃ৫)। সুষ্ঠু তদারকি, জেলা ও থানা শিক্ষা প্রকল্প কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনে অনিহার কারণে এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ব্যবহত হচ্ছে। সুতরাং পরিশেষে একথা বলা যায় যে, নারী শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচীর সফলতা আনতে হলে নারী শিক্ষার সাথে জড়িত সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় আনতে হবে তৎসংগে প্রশাসন ব্যবস্থাকে কঠোর হতে হবে।

উপসংহার

বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি, চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

কাজী নজরুল ইসলামের স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়েই প্রমাণিত হয় উন্নয়নে নারীর অবদান কোন অংশেই কম নয়। নারী সমাজকে পেছনে ফেলে রেখে কখনোই জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। এর জন্যই প্রয়োজন নারী শিক্ষা। একজন শিক্ষিত সচেতন নারীই পারে জাতীয় উন্নয়নকে অর্থবহ করে তুলতে। আজকের দিনের শিশুটি আগামীদিনের জাতির মেরুদন্ড। আর এই শিশুটিকে গড়ে তোলার দায়িত্ব ন্যস্ত মায়ের উপর। তার সার্বিক তত্বাবধান ও পরিচালনাই পারে শিশুকে যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে। আর এই জন্যই প্রয়োজন মায়ের শিক্ষা। তাই সর্বাগ্রে আমাদেরকে নারী শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে। একটি প্রবাদ আছে "একজন পুরুষ শিক্ষিত হলে শুধু সেই শিক্ষিত হয়। কিন্তু একজন নারী শিক্ষিত হলো গোটা পরিবার শিক্ষিত হয়।" শুধু তাই নয়, নেপোলিয়ন বোনাপার্টও এক সময় বলেছিলেন "Give me an educated mother then I shall give you an educated nation". সুতরাং দেখা যাচ্ছে কালে কালে, যুগে যুগে নারী শিক্ষা উন্নয়নের চাবিকাঠি। তাই নারী শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যমান সকল বাধা বিপত্তির অবসান ঘটিয়ে তাদেরকেও জাতীয় উন্নয়নের শরীক হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। সরকারের একার পক্ষে এই মহান দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। এরজন্য জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা ও অংশ গ্রহণ একান্ত আবশ্যক।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। আলমুতী, আবদুল্লাহ ১৯৯১, *শিক্ষা ও বিজ্ঞানঃ নতুন দিগন্ত,* ঢাকা, অনুপম প্রকাশনি।

২। উন্মেষ, ১৯৯৩, "শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর বাস্তাবায়ন ও মনিটরিং এর নীতিমালা", *উন্মেষ,* (রাজশাহী বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা (ত্রৈমাসিক মুখপত্র), ৩য় বষ, ১১শ সংখ্যা।

৩। খন্দকার, নাসরীন ১৯৯৫, "নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন", *উন্নয়ন পদক্ষেপ,* ২য় সংখ্যা, ঢাকা, লালমাটিয়া।

৪। পারভীন, রীতা ১৯৮৮, *বাংলাদেশের নারী উন্নয়নে মহিলা সংগঠনের ভূমিকা,* (অপ্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন) রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৫। বালা, হিরালাল ১৩৯৭ (বাং), "বাংলাদেশের দরিদ্রঃ অতীত ও বর্তমান, সমস্যা ও সমাধান", *বাংলাদেশ লোক প্রশাসন পত্রিকা,* ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

৬। বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় রিপোর্ট, বেইজিং, ১৯৯৫, "বাংলাদেশের নারী, সমতা,উন্নয়ন ও শান্তি", *উন্নয়ন পদক্ষেপ,* ঢাকা, লালমাটিয়া

৭। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা ১৯৯৪, "প্রতি থানায় শিক্ষা সুবিধা বাড়ানোর উদ্যোগ" *সংবাদ,* ১৮ই ফেব্রুয়ারী।

৮। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা ১৯৯৬, "কৃড়িগ্রামে ছাত্রী উপবৃত্তির টাকা প্রদানে অনিয়ম" *ভোরের কাগজ,* ২২শে নভেম্বর।

৯। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা ১৯৯৬, "ছাত্রী উপবৃত্তি", *দৈনিক ইত্তেফাক* ২৪শে নভেম্বর।

১০। রহমান, নয়ন ১৯৯৩, "বিগত শতাব্দীর আলোকিক ভুবনে মহিলাদের অবস্থান", *মাসিক প্রদ্যোত,* অষ্টম সংখ্যা।

১১। রায়, শর্মিষ্ঠা ১৯৯৪, *"আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে গ্রামবাংলার নারীশিক্ষা সমস্যাঃ একটি থানা ভিত্তিক সমীক্ষণ,* (অপ্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, ইনষ্টিটিউট অব বাংলাদেশ ষ্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

১২। সুলতানা শামিমা, ১৯৯৩, "প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা", *মাসিক প্রদ্যোত,* নবম সংখ্যা।

১৩। হক, এনামুল ১৯৯৬, "Poverty Alleviation Through Self Reliance" *দারিদ্র বিমোচন ও তৃণমুলে উন্নয়ন,* এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল এডভান্সমেন্ট (আশা), ঢাকা, মোহাম্মদপুর।

১৪। হোসেন, সৈয়দ আনোয়ার ১৯৯৫, "নারীর ক্ষমতায়নঃ শিক্ষা ও সংস্কৃতি", *উন্নয়ন পদক্ষেপ,* ঢাকা, লালমাটিয়া।

১৫। Ahmed, A.B. Sharfuddin, 1981. "Popular Beliefs, Rituals and Religious Practices in Bangladesh Village" *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies.* Vol. V, Rajshahi University.

১৬। Ahmed, Alia 1991. *Women and Fertility in Bangladesh,* India, SAGE Publivations Ltd., New Delhi.

১৭। Ahmed, Kazi Saleh 1978, "Primary Education in Rural Bangladesh", *Rural Development in Bangladesh: Trends & Issues,* eds., Mohammad Mohabbat Khan & Habib Mihammad Jafarullah, Dhaka, Centre for Administrative Studies, Bangladesh.

১৮। Bangladesh Bureau of Sratistics 1992.

১৯। Blanchet, Therese 1984, *Meanings and Rituals of Birth in Rural Bangladesh,* Dhaka, University Press Ltd.

২০। Chaudhury, Rafiqul Huda & Ahmed, Nilufar Raihan 1980. *Female Status in Bangladesh,* Dhaka, BIDS.

২১। Mabud, Mohammad A. 1990, "Women's Roles: Health & Reproductive Behaviou" *South Asia Study of Population Policy and Programmes.* Dhaka, UNFPA.

২২। Mia, Ahmedullah 1985. "On Integration of Women in Economic Development" Bangladesh Case", *Dhaka University Studies,* Vol.2

২৩। Rahman, Shamsur, & Sarkar, P.C. 1989. "Status and Role of Bangladesh Women in Socio economic & Political Dimensions: a qualitative analysis" R.K. Sapru, (ed.), *Women and Development,* New Delhi, Ashis Publishing House.

২৪। Satter, Ellen 1975. "Village Women's Work", *Women for Women Research and Study Group*, Dhaka, Women for Women.

২৫। Satter, Ellen 1982, *Universal Education in Bangladesh,* Dhaka, University Press Ltd.

২৬। Sarkar, P.C. & Banu, Tahmina 1990. "Culture Age at Marriage and Fertility Behaviour in a Village of Bangladesh" *South Asian Anthropologist.*

২৭। Statistical Year Book 1991.

২৮। Statistical Pocket Book 1995.

২৯। Jahan, Rounaque 1975. "Women in Bangladesh". *Women for Women Research and Study Group,* Dhaka, Women for Women.

৩০। Jennings, James 1990. *Adult Literacy, Master or Servant: a case study from Rural Bangldesh,* Dhaka, University Press Ltd.

বাঁকরইলের দুর্গামন্দির

কাজী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান*

নওগাঁ জেলার পত্নীতলা থানার ৩নং দিবর ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্গত হলো বাঁকরইল গ্রাম। গ্রামটি–নজিপুর সাপাহার পাকা সড়কে নজিপুর হতে প্রায় ১২ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে রয়েছে একটি বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান কার্যালয়, একটি ছোট হাট এবং একটি পুরাতন অফিস। কাচারী অফিসটি এই গ্রামের পাকাসড়ক হতে আনুমানিক মাত্র ৪০০ গজ দক্ষিণে বাঁকরইল বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের পরেই অবস্থিত। এই কাচারী অফিসের সম্মুখেই রয়েছে এক অনন্য সুন্দর দূর্গামন্দির। মন্দিরটি আধুনিককালে নির্মিত হলেও পরিত্যক্ত থাকায় পরিচর্যা ও সংস্কারের অভাবে ভগ্নদশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। কাচারী অফিস ও এই মন্দিরের চারিদিকের বেষ্টনী প্রাচীর বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। অফিসভবনের অবস্থাও বেশ জরাজীর্ণ। মন্দিরটিতে দূর্গাপূজা উৎসব পালিত হতো বলেই এটি দূর্গামন্দির নামে পরিচিত। বর্তমান প্রবন্ধে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকা এই দূর্গামন্দিরের স্থাপত্য ইতিহাস সুধি সমাজে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

ভূমি নকসা ও গঠন

মন্দিরটির প্রধান নির্মাণ উপকরণ হলো ইট, চুন, সুরকি, লোহা ও কাঠ। ভূমি নকসাগত (ভূমি নকসা–১) দিক দিয়ে সমগ্র মন্দিরটি প্রধানতঃ দুটি কক্ষ ও একটি বারান্দায় (corridor) বিভক্ত (আলোকচিত্র–১)। কক্ষ দু'টির উত্তরেরটি গর্ভগৃহ[১] এবং দক্ষিণেরটি ভোগ ঘর[২]। গর্ভগৃহটি আয়তাকার। এর অভ্যন্তরীণ পরিমাপ উত্তর দক্ষিণে ১৭´–১০´´ ও পূর্ব–পশ্চিমে ৮´–১০´´। মধ্যস্থলে একটি আয়তাকার (৬´–৫´´ x ২´–৭´´ x ০´–১০´´) বেদী নির্মিত রয়েছে। তাছাড়া উত্তর দেয়ালে পাশাপাশি দু'টি কুলঙ্গী বিদ্যমান। গর্ভগৃহের দক্ষিণের ক্ষুদ্র ভোগ ঘরটির অভ্যন্তরীণ পরিমিতি ৮´–১০´´ x ৬´–৬´´। উভয় কক্ষে যাতায়াতের জন্য মধ্যবর্তী দেয়ালে একটি প্রবেশপথ রয়েছে। তাছাড়া ভোগঘরের দক্ষিণ দেয়ালে একটি প্রবেশপথ ও পূর্ব দেয়ালে একটি

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

জানালা বিদ্যমান। গর্ভগৃহ ও ভোগঘর উভয় কক্ষের সম্মুখে একটি আয়তাকার টানা বারান্দা রয়েছে। বারান্দাটির পরিমাপ উত্তর–দক্ষিণে ১৪´ –৪´´ ও পূর্ব–পশ্চিমে ৪´ – ৬´´ । গর্ভগৃহ ও ভোগঘর হতে বারান্দায় যাতায়াতের জন্য বারান্দামুখী যথাক্রমে ভোগঘর হতে একটি ও গর্ভগৃহ হতে তিনটি প্রবেশপথ রয়েছে। গর্ভগৃহের তিনটি প্রবেশপথের মধ্যেরটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। সবকটি প্রবেশ পথই উন্মুক্ত ও অর্ধবৃত্তাকার খিলানে নির্মিত। খিলানস্তম্ভ দু'টি আয়তাকারে রচিত। অপরদিকে ভোগঘরের তিনটি প্রবেশ পথ এবং জানালা ঈষৎ বক্রাকৃতির খিলানে (Segmental Arch) নির্মিত এবং প্রতিটি প্রবেশপথেই কাঠের দরজা ছিল যা বর্তমানে নেই। আয়তাকার বারান্দার সম্মুখভাগ (অর্থাৎ পশ্চিমাংশ) তিনটি গোলায়িত স্তম্ভের (আইওনীয় ধাঁচের স্তম্ভ) উপরে স্থাপিত চারটি অর্ধবৃত্তাকার খিলানপথ সম্বলিত। এদের সবকটিই বর্তমানে উন্মুক্ত হলেও দক্ষিণের খিলানপথ দু'টি একসময় লোহার জালি দ্বারা বন্ধ ছিল বলে অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয়। বারান্দার উত্তর ও দক্ষিণাংশের দু'টি উন্মুক্ত অংশ ইষ্টক জালির দেয়াল সম্বলিত। মন্দিরটির দেয়ালের পুরত্ব ২´ – ০´´ এবং ভূমি থেকে মেঝের উচ্চতা প্রায় ২´ – ৬´´ । মন্দিরে আরোহণের জন্য বারান্দার সম্মুখে ও ভোগঘরের দক্ষিণ দিকের প্রবেশপথের সম্মুখে চারধাপ বিশিষ্ট সিঁড়িপথ রয়েছে। মন্দিরটির গর্ভগৃহ, ভোগঘর ও বারান্দার উপরিভাগ লোহা ও কাঠের তীর–বর্গায় নির্মিত সমতল ছাদে এবং মেঝে পলেস্তারায় আচ্ছাদিত। গঠনশৈলী অনুযায়ী মন্দিরটি আধুনিককালের নির্মিত 'দালান মন্দির'[৩] শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত।

অলঙ্করণ

মন্দিরটির গর্ভগৃহ ও ভোগঘরের অন্তর্ভাগ সম্পূর্ণটাই চুন–বালির সংমিশ্রণযুক্ত পলেস্তারার আস্তরণে আচ্ছাদিত এবং সাদা চুনকামযুক্ত। এই দু'টি কক্ষের অভ্যন্তরভাগে কোন নকসা পরিলক্ষিত হয় না। তবে গর্ভগৃহের বারান্দামুখী উন্মুক্ত খিলানপথগুলি (বারান্দার পূর্ব দেয়ালে) একটি করে আয়তাকার কাঠামোর (Frame) মধ্যে স্থাপিত। দুই খিলানের মধ্যবর্তী ত্রিকোণাকার ভূমিসমূহ (Spandrel) মধ্যস্থলে সর্পফণাযুক্ত রেখা এবং খিলানমুখসমূহে উপর্যুপরি তিন ধাপ বিশিষ্ট ঢেউ ও ফুল নকসা খচিত (আলোকচিত্র–২)। আয়তাকার কাঠামোর (Frame) উপরে উত্তর–দক্ষিণে লম্বা টানা পাড়টি (Frieze) গোলাপ ও লতাপাতা সম্বলিত নকসায় শোভিত। আয়তাকার স্তম্ভগুলির সম্মুখভাগ অর্ধগোলায়িত শিরালো নকসাযুক্ত। ভোগঘরের বারান্দামুখী প্রবেশপথটি স্তম্ভ–সর্দল পদ্ধতিতে নির্মিত হলেও বারান্দার দিকে প্রবেশপথটির উপরিভাগ খিলানকৃতির করে তন্মধ্যে পদ্মফুলের নকসা উৎকীর্ণ রয়েছে। নকসাগুলি সবই স্বল্পোদ্ভুত (Low-relief) পদ্ধতি অবলম্বনে সৃষ্ট।

মন্দিরটির গৃহমুখ (Facade) পলেস্তারায় উৎকীর্ণ আকর্ষণীয় নকসায় সজ্জিত। সম্মুখভাগের খিলানপথসমূহের খিলানগুলিও গর্ভগৃহের প্রবেশপথটি ন্যায় আয়তাকার কাঠামোর (Frame) মধ্যে সংস্থাপিত। খিলান পার্শ্বস্থ ত্রিকোণাকার ভূমিসমূহ পেঁচানো লতাপাতার সহিত কোন কোনটিতে (উত্তর দিক হতে দ্বিতীয় খিলানপথের উপরে) ফুলের কুঁড়ি সংযুক্ত নকসা বিদ্যমান (আলোকচিত্র–৩)। দুই খিলানের মধ্যবর্তী অংশে স্থাপিত আয়তাকার কাঠামো বিভক্তকারী তিনতল বিশিষ্ট রেখাসমূহের একদিকের পার্শ্বতল সর্পফণা ও অন্য পার্শ্বতল পেঁচানো নকসাযুক্ত। চারটি খিলানপথের উত্তর দিক হতে ১ম ও ৩য়টির খিলানমুখ ঢেউনকসা ও তদুপরি পেঁচানো নকসা এবং ২য় ও ৪র্থটির খিলানমুখ যথাক্রমে ঢেউ নকসা ও তদুপরি সর্পফণা নকসায় শোভিত (আলোকচিত্র–৩)। খিলানসমূহের আয়তাকার কাঠামোর উপরে উত্তর–দক্ষিণে লম্বা একটি মোটা পাড় নকসা বিদ্যমান। পাড়টির মধ্যস্থলে পরস্পরমুখী দু'টি মকর[৪] বৃত্তাকারে উৎকীর্ণ রয়েছে (আলোকচিত্র–৩)। বৃত্তাকার অংশে মন্দিরটির নির্মাণকাল খোদিত রয়েছে। মকর দু'টির দুই পার্শ্বের সমগ্র পাড়টি গোলাপ ও চক্রাকারে পেঁচানো লতাপাতাযুক্ত চমৎকার নকসায় শোভিত (আলোকচিত্র–৩)। মন্দিরটির কার্ণিসের নিম্নভাগ খাঁজনকসাখচিত। ইমারতটির ছাদ–পাঁচিলের (Parapet) উপর একটি ত্রিভুজাকার ফলকে (acroteria) বিপরীতমুখী হস্তীর জোড়ামস্তক বিদ্যমান (আলোকচিত্র–৩)। ফলকটির মধ্যস্থলে একটি গোলাকার ছিদ্র এবং ছিদ্রের উভয়পার্শ্ব ফুল ও লতাপাতাযুক্ত নকসা সমৃদ্ধ। নকসাগুলির সবই সন্নোদ্ভুত পদধতিতে উৎকীর্ণ। মন্দিরটির অন্যান্য দিকে একমাত্র পলেস্তারার আচ্ছাদন ছাড়া আর কোন নকসা পরিলক্ষিত হয় না। তবে সংস্কারের অভাবে পলেস্তারার আস্তরণগুলি বর্তমানে খুলে পড়ছে।

নির্মাণকাল ও নির্মাতা

মন্দিরটির গৃহমুখের (Facade) খিলানপথসমূহের উপরের পাড়নকসার মধ্যস্থলে উৎকীর্ণ চক্রাকারে পরস্পরমুখী দু'টি মকরের মধ্যস্থলে নির্মাণ তারিখ সম্বলিত একটি শিলালিপি বিদ্যমান। উক্ত শিলালিপিতে মন্দিরটি বাংলা ১৩২৩ সনে (ইং ১৯১৬ খ্রীঃ) স্থাপিত বলে উল্লেখ রয়েছে।[৫] কিন্তু শিলালিপিতে মন্দির নির্মাতার নামের উল্লেখ না থাকায় এটি কে নির্মাণ করেছিলেন তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা দুষ্কর। তবে স্থানীয় বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের[৬] ভাষ্য অনুযায়ী মন্দিরটি বর্ধমানের জমিদার শ্রী নৃসিংহনন্দী চৌধুরী নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়। বর্তমানে মন্দিরটিতে আর কোন পূজা উৎসব না হওয়ায় অবহেলা ও পরিচর্যার অভাবে ক্রমেই জরাজীর্ণ হয়ে এর অতীত সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলেছে।[৭]

বৃটিশ শাসনামলে বাংলাদেশে নির্মিত সমতল ছাদ বিশিষ্ট দালান মন্দিরের বহু নিদর্শন বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ খুলনার শ্যামনগরের চন্দ্র ভৈরব ও যশোরেশ্বরী মন্দির, কালিগঞ্জের কৃষ্ণমন্দির, পাবনা জেলার তাড়াশের গোপাল ও বৃন্দাবন বিহারী মন্দির, ফরিদপুর জেলার জেলার ভাঙার শ্যামনারায়ন মন্দির, রাজশাহী জেলার পুঠিয়ার গোপাল বা রাধাকান্ত মন্দির ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৮] মন্দিরগুলি সবই আধুনিককালে নির্মিত।

বাংলাদেশের অন্যান্য মন্দিরের ন্যায় বাঁকরইলের এই দুর্গামন্দিরও গঠনশৈলী ও অলঙ্করণে মুসলিম স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত। মন্দিরটির খিলান মুসলমানদের প্রচলিত ভুসোয়া (Vousoir) পদ্ধতিতে রচিত এবং গাত্রালঙ্কারে পলেস্তারার উপর উৎকীর্ণ গোলাপ নকসা, বিভিন্ন ফুল, পেঁচানো লতাপাতা ইত্যাদি মুসলিম স্থাপত্যের গাত্রালঙ্কারের সহিত যথেষ্ট সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং বাঁকারইলের এই দুর্গামন্দিরটি বাংলাদেশের সমতল ছাদ বিশিষ্ট দালান মন্দিরের ধারাবাহিকতা রক্ষায় যে বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

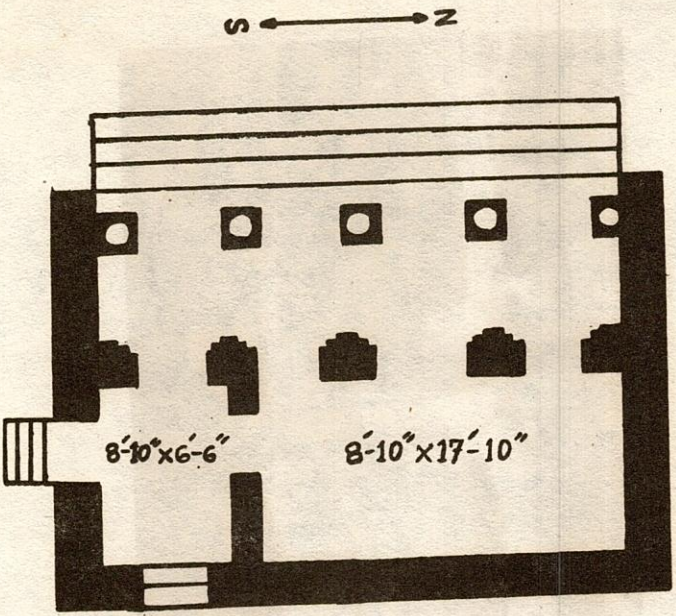

স্কেল–১″ = ৮′ – ০″

ভূমিনকসা – ১ঃ বাঁকরইলের দুর্গামন্দির

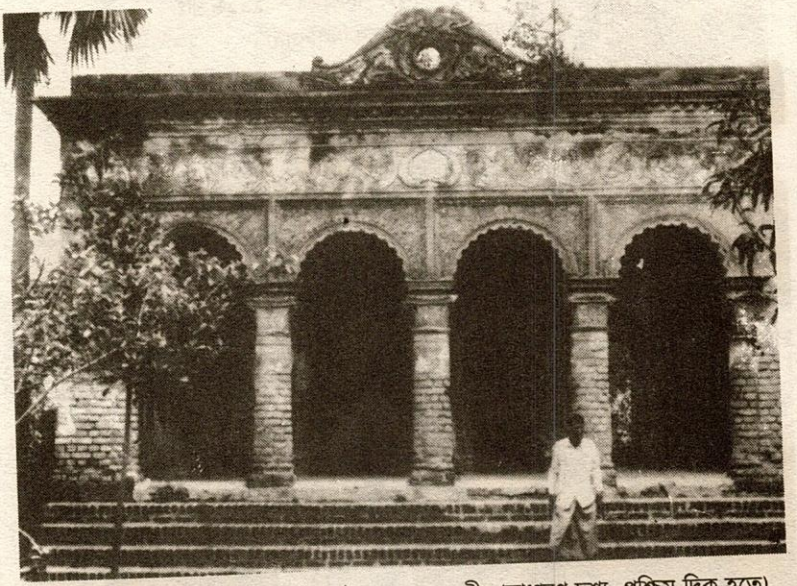

আলোকচিত্র–১ঃ দুর্গামন্দির, বাঁকরইল – ১৯১৬ খ্রীঃ (সাধারণ দৃশ্য, পশ্চিম দিক হতে)

আলোকচিত্র–২ঃ দুর্গামন্দির, বাঁকরইল – ১৯১৬ খ্রীঃ
(গর্ভগৃহে প্রবেশের খিলানপথ)

আলোকচিত্র–৩ঃ দুর্গামন্দির, বাঁকরইল (গৃহমুখের সাধারণ দৃশ্য)

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১। মন্দিরের ভিতরের কক্ষ যেখানে বেদী স্থাপিত থাকে। যজ্ঞ বা পূজার সবকিছুই এই গৃহে অনুষ্ঠিত হয়।

২। মন্দিরের যে ঘরে দেবতাকে নিবেদিত ভোজ্য বস্তু রাখা হয় তাকে বলে ভোগঘর।

৩। আধুনিককালে কড়ি বরগার সমন্বয়ে নির্মিত সমতল ছাদ বিশিষ্ট মন্দিরগুলিকে শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার দালান মন্দির নামে অভিহিত করেছেন। দ্রষ্টব্যঃ শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ (কলিকাতাঃ জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, বাং ১৩৮৮), পৃঃ ৬১৪।

৪। মকর হলো হাঙ্গর বিশিষ্ট একধরনের বৃহৎ সামুদ্রিক জন্তু। এটি গঙ্গা দেবীর বাহন, কামদেবের ধ্বজচিহ্ন/বাহন। কখনো/কখনো জলদেবতা বরুণকেও মকরের উপর উপবিষ্ট দেখা যায়। দ্রষ্টব্যঃ কাজী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, *পুঠিয়ার রাজবংশঃ ইতিহাস ও স্থাপত্যকর্ম* (অপ্রকাশিত এম ফিল অভিসন্দর্ভ, আই.বি.এস. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬) পৃঃ ২৪৫, পরিশিষ্ট–ঘ।

৫। শিলালিপিতে উল্লেখ রয়েছে 'সন ১৩২৩ সালে স্থাপিত"।

৬। বাঁকরইল নিবাসী মোঃ অলীউল্লাহ, বয়স আনুমানিক ৯০ এর ঊর্ধ্বে, পিং মরহুম আমীরউদ্দীন শেখ এবং শ্রী প্রল্লাদচন্দ্র বর্মণ, বয়স ৮৬ বছর, পিং মৃত রামপদ বর্মণ এই তথ্যগুলি প্রদান করেন। বাঁকরইল তহশীল অফিস হতেও একই তথ্য পাওয়া যায়।

৭। দীর্ঘ প্রায় ২৩/২৪ বছর পর ১৯৯৭ সনে মন্দিরটিতে পুনরায় দূর্গা পূজা উৎসব পালিত হয়। তবে কোন সংস্কার হয়নি।

৮। রতনলাল চক্রবর্তী, *বাংলাদেশের মন্দির* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), পৃঃ ৪৩–৫০, কাজী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ১৭৯।

স্কেল–১″ = ৮′ – ০″

ভূমিনকসা – ১ঃ বাঁকরইলের দুর্গামন্দির

আলোকচিত্র–১ঃ দুর্গামন্দির, বাঁকরইল – ১৯১৬ খ্রীঃ (সাধারণ দৃশ্য, পশ্চিম দিক হতে)

আলোকচিত্র–২ঃ দুর্গামন্দির, বাঁকরইল – ১৯১৬ খ্রীঃ (গর্ভগৃহে প্রবেশের খিলানপথ)

আলোকচিত্র–৩ঃ দুর্গামন্দির, বাঁকরইল (গৃহমুখের সাধারণ দৃশ্য)

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়

মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম *

সার সংক্ষেপ

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দীর্ঘকাল পর ১৯৫৪ সালে সাধারণ নির্বাচন হলেও সেই নির্বাচন পাকিস্তান সামরিক চক্রের কারসাজিতে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার পর একটি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন এদেশের জনগণের নিকট দীর্ঘ প্রত্যাশিত ছিল। ১৯৭০ এর নির্বাচন তাদের সেই প্রত্যাশা বাস্তবায়নে একটি সুযোগ এনে দেয়। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আওয়ামীলীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী জনগোষ্ঠীকে ব্যাপকভাবে আওয়ামী লীগের পতাকাতলে সুসংগঠিত করার মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়, ৭০ এর নির্বাচনে তাঁর দল পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে জয়লাভ করে। অপর পক্ষে, নির্বাচনী ফলাফলে বিস্মিত জেনারেল ইয়াহিয়া এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো শুরু থেকেই নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে অপ্রত্যাশিত জটিলতা সৃষ্টি করেন ও জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখেন। জেনারেল ইয়াহিয়া অজুহাত দেখান যে, আওয়ামী লীগের স্বায়ত্তশাসন দাবী (ছয় দফা) পাকিস্তানে সাংবিধানিক সংকটের সূচনা করবে। নির্বাচনের রায় অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করা, এবং পরবর্তীতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর গণহত্যার প্রতিক্রিয়ায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাঙালী জাতি স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা করে। সুতরাং ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ও নির্বাচনী রায়কে কেন্দ্র করে যে নতুন পটভূমির জন্ম হয় তারই প্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পায়। তাই, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়' বিষয়টি গবেষণার দাবী রাখে। আলোচ্য প্রবন্ধে সরকারী প্রকাশনা, সমসাময়িক বিশ্লেষণ ও প্রাপ্ত সংবাদপত্রের তথ্যের ভিত্তিতে ওই সাধারণ নির্বাচনের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

---

* প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ক. পটভূমিঃ

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন প্রাপ্ত-বয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকার এবং স্বতন্ত্র নির্বাচক মন্ডলী – এই দুই নীতির ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়।[১] ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটে এবং পূর্ব পাকিস্তানে হক – ভাসানী – সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট[২] অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে।[৩] যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীদের এই বিজয় স্বাভাবিক কারণেই জনগণকে আশান্বিত করেছিল। দেশবাসীর ধারণা হয়েছিলঃ "অতঃপর ২১ দফা বাস্তবায়িত হবে, বঞ্চনার অবসান হবে এবং পূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ সমাজে শান্তি, স্বস্তি, স্থিতি ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে।"[৪] কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজয়ী হলেও প্রধানত অভ্যন্তরীণ উপদলীয় কোন্দলের কারণে যুক্তফ্রন্ট পাকিস্তানের রাজনীতিতে কোন মৌলিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়নি।[৫] এই নির্বাচন ছাড়াও ১৯৬৪ সালের নভেম্বরে পাকিস্তানের উভয় অংশে অনুষ্ঠিত হয় মৌলিক গণতন্ত্রীদের নির্বাচন[৬] এবং ১৯৬৫ সালের ২রা জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন।[৭] উল্লেখ্য নির্বাচনে আইউব খান জয়লাভ করলেও ঢাকা ও করাচি শহরে তিনি পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু আইউব খানের দশ বছরের শাসনামলে (১৯৫৮–১৯৬৯) পাকিস্তানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়, তথাপি জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। কারণ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য (Economic disparity) উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৮] আর এই অর্থনৈতিক বৈষম্যই আইয়ুবী শাসনামলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির মূল কারণ যা স্বায়ত্তশাসন দাবীর সমন্বয়কারী রাজনীতিকদের হস্ত সুদৃঢ় করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক বৈষম্যকে কেন্দ্র করে ১৯৬৬ সালে আওয়ামীলীগ "ছয় দফা" আন্দোলনকে জোরদার করেছিল।[৯] বস্তুত আওয়ামীলীগের এই ছয়দফাকে বাংলার জনগণ তাদের 'প্রাণের দাবী' বা 'বাঁচার দাবী' হিসেবে গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দলীয় কর্মীদের মাধ্যমে সারাদেশে প্রচার করার মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। এভাবে স্বল্পকালের মধ্যেই ছয় দফার দাবীতে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হলে প্রেসিডেন্ট আইউব খান শেখ মুজিবুর রহমানসহ প্রায় সকল আওয়ামীলীগ নেতাকে গ্রেফতার করেন। এ সময়ে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা" নামে "এক চক্রান্তমূলক মিথ্যা মামলা" দায়ের করা হয়।[১০] এই মামলায় শেখ মুজিব এবং তাঁর সহচরদের বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে পাকিস্তানী শাসকবর্গ অভিযুক্ত করে। এর ফলে "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা" চলাকালে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারী মাসে সারাদেশে প্রচণ্ড গণঅভ্যুত্থান ঘটে। ফলে আইউব খান ওই মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন এবং শেখ মুজিব সহ সকল রাজবন্দীকে মুক্তির নির্দেশ দেন। এ সময় পাকিস্তানে পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত্র ও জনগণের পূর্ণ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য দেশ ব্যাপী প্রচন্ড আন্দোলনের মুখে পাকিস্তানের প্রধান

সেনাপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে প্রেসিডেন্ট আইউব খান পদত্যাগ করেন।[১১] জনগণের সুদীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা উপলব্ধি করে এবং কিছুটা বিভিন্ন মহলের চাপে ১৯৬৯ সালের ২৮শে নভেম্বর গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর, এক ব্যক্তি এক ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচন, ও অধিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দান করেন।[১২] এ ভাষণে প্রেসিডেন্ট উল্লেখ করেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভেঙ্গে দিয়ে পৃথক পৃথক প্রদেশ গঠনে এবং 'এক ব্যক্তির এক ভোট' এর ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদ গঠনের জন্য ৫ই অক্টোবর (১৯৭০) দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তিনি আরো ঘোষণা করেন যে, ১লা জানুয়ারী (১৯৭০) থেকে যাবতীয় বিধি নিষেধ প্রত্যাহার করে দেশে পুনরায় রাজনৈতিক তৎপরতা শুরুর অনুমতি দেয়া হবে। এ ছাড়াও অক্টোবর (১৯৭০) মাসে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদে প্রথম অধিবেশন শুরুর দিন থেকে ১২০ দিনের ভেতরে ভবিষ্যৎ সংবিধান প্রণয়নের কাজ সমাধা করতে হবে এবং প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভের পরক্ষণেই তা পাকিস্তানের নয়া সংবিধান হিসেবে গণ্য হবে। সংবিধান প্রণয়নের কাজ শেষ হওয়ার পর প্রাদেশিক পরিষদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং এর পরক্ষণেই প্রতিনিধিত্বশীল কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। এই সমুদয় দায়িত্ব পালনকালে এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ক্ষমতা হস্তান্তরের কর্মসূচী বাস্তবায়ন পর্যায়ে সামরিক আইনই দেশে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস হিসেবে বহাল থাকবে।[১৪]

খ. রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচনী ইস্যু ও প্রচারাভিযানঃ

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণাকে পাকিস্তানের উভয়াংশের রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দ স্বাগত জানায়। আওয়ামীলীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ওই ঘোষণা সম্পর্কে এক বিবৃতিতে বলেনঃ ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়সূচী ও উহার বাস্তবায়ন পদ্ধতির প্রশ্নে মতানৈক্যের অবকাশ দেখা দিলেও দেশের সমস্যা অনুধাবনের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা প্রশংসাযোগ্য।[১৫] তবে নির্বাচনী পদ্ধতির প্রশ্নে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বলেন ১৯৬১ সালের আদমশুমারীর[১৬] ভিত্তিতেই পরিষদের আসন বন্টন করা হবে।[১৭] এ ছাড়াও তিনি ৩০শে মার্চ (১৯৭০) আইনগত কাঠামো আদেশ (Legal Framework Order) বা এল.এফ.ও. জারী করেন।[১৮] কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক ঘোষিত এই আইনগত কাঠামো ছিল গনতান্ত্রিক মূলনীতির পরিপন্থী। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আইনগত কাঠামো আদেশ সংশোধনের জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আবেদন জানান।[১৯] পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামীলীগ গণতন্ত্রের মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্য আনয়ন এবং এর জন্য আইনগত কাঠামো নির্দেশ যথাযথভাবে সংশোধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।[২০]

প্রাদেশিক ন্যাপ (ওয়ালী) প্রধান অধ্যাপক মোজ্জাফ্ফর আহমদ আইনগত কাঠামোর ২৫ এবং ২৭ ধারার[২১] তীব্র সমালোচনা করে তা বাতিলের দাবী জানান।[২২] একইভাবে প্রেসিডেন্টের আইনগত কাঠামোর বিরোধিতা করে মওলানা ভাসানী, আতাউর রহমান খান ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাদের স্ব স্ব বক্তব্য পেশ করেন। আইনগত কাঠামো আদেশের প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামীলীগ ৭ই এপ্রিল মঙ্গলবার এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) ১৩ই এপ্রিল সোমবার প্রতিবাদ দিবস পালন করে।

তবে ১৯৭০ সালের এই নির্বাচনে 'জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব' এর ব্যবস্থা থাকার ফলে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান অপেক্ষা জাতীয় পরিষদে অধিক সংখ্যক আসন লাভ করে। আসন সংখ্যা ছিল নিম্নরূপঃ

সারণী ঃ১

পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ নির্বাচন ১৯৭০

আসন সংখ্যা

প্রদেশের নাম	সাধারণ আসন	সংরক্ষিত মহিলা আসন	মোট আসন
পূর্ব পাকিস্তান	১৬২	০৭	= ১৬৯
পাঞ্জাব	৮২	০৩	= ৮৫
বেলুচিস্তান	০৪	০১	= ০৫
সিন্ধু	২৭	০১	= ২৮
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১৮	০১	= ১৯
কেন্দ্র শাসিত উপজাতি এলাকা সমূহ	০৭	-	= ০৭
	৩০০	১৩	৩১৩

তথ্য সূত্রঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩শ বর্ষ, ৩২৪তম সংখ্যা, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৭০।

নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার অনেক আগে থেকেই আওয়ামী লীগ সুসংগঠিত হতে থাকে।[২৩] ফলে এই নির্বাচনকে তারা স্বাগত জানায়। কারণ এটি স্পষ্ট যে, ১৯৭০ সালের নির্বাচন গুণগতভাবে ভিন্ন ছিল। কেননা আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান বুঝতে পেরেছিলেনঃ

> নির্বাচন ও গণ আন্দোলন পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত।... যেখানে শাসক গোষ্ঠীর চক্রান্তে গণতন্ত্র ব্যাহত হয়, অথবা নির্বাচনের ফল জনগণ ভোগ করতে পারে না, সেখানেই আন্দোলন প্রয়োজন হয়। সে আন্দোলনের চরম উদ্দেশ্য সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠান। এই যুক্তিটাই আসন্ন নির্বাচনে প্রয়োগ করা যাক।[২৪]

পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য দলগুলির নেতারা তখন এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আওয়ামীলীগের সাথে ঐক্য জোট গঠনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। কেননা ১৯৬৯ সালের শেষ দিকে পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের ব্যাপারে বেশ হতাশায় পড়ে গিয়েছিল। এ সময় পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে 'তাত্ত্বিক পন্থী' অথবা 'বামপন্থী' বলে পরিচিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি 'ঐক্য

চাই' বলে শ্লোগান তুললো। কিন্তু ১৯৭০ সালের ৪ঠা জুন আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে দলের সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্টে পরিস্কারভাবে উল্লেখ করা হয় যে, আওয়ামী লীগ আগামী নির্বাচনে কোন ঐক্য জোটে যাবেনা।[২৫] ফলে রাজনৈতিক দলগুলি পরে নির্বাচনকে উপলক্ষ করে কখনও 'একমনা' কখনও 'ইসলাম পছন্দ' ইত্যাকার নিয়মে ঐক্য গড়ে তোলে। এ কারণেই ৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে দল অনুযায়ী তাদের প্রার্থীদের আসন বন্টনের চিত্র ছিল নিম্নরূপঃ[২৬]

সারণীঃ ২

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ৩০০টি আসনে রাজনৈতিক দলওয়ারী তালিকা
(কেন্দ্র শাসিত উপজাতি এলাকাসমূহ ব্যতিরেকে)*
সাধারণ নির্বাচন, ১৯৭০

দল	পূর্ব পাকিস্তান	বেলুচিস্তান	পাঞ্জাব	উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	সিন্ধু	মোট প্রার্থী
আওয়ামীলীগ	১৬২	০১	০২	০২	০২	১৬৯
জামাতে ইসলাম	৬৯	০২	৪৩	১৫	১৯	১৪৮
পাকিস্তান মুসলিমলীগ (কাইয়ুম)	৬৫	০৪	৩৪	১৭	১২	১৩২
পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাদের)	৯৩	-	২৪	০১	০৬	১২৪
পাকিস্তান পিপলস পার্টি	-	০১	৭৭	১৬	২৫	১১৯
কাউন্সিল মুসলিম লীগ	৫০	০২	৫০	০৫	১২	১১৯
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	৮১	০১	২১	০২	০৩	১০৮
জমিয়তউল-উলেমা-ই-পাকিস্তান (হাজারভী)	১৩	০৪	৪৭	১৯	২০	১০৩
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী)	৩৬	০৩	-	১৬	০৬	১০৩
নিজাম-ই-ইসলাম (থানভী)	৪৫	-	০৪	০২	০১	৫২
জমিয়ত-উলেমা-ই-পাকিস্তান	-	-	৩৯	০১	০৮	৪৮
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী)	১৫	০১	০২	-	০২	২০
পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগ (পি.এন.এল)	১৩	-	-	-	-	১৩
এস.কে.এম.পি.পি.এম. (মাহাজ)	-	-	০১	-	০৫	০৬
ইসলামিক ডেমোক্রেটিক পার্টি	০৫	-	-	-	-	০৫
জাতীয় গণমুক্তি দল	০৪	-	-	-	-	০৪
কংগ্রেস	০৪	-	-	-	-	০৪
কৃষক শ্রমিক পার্টি	০৩	-	-	-	-	০৩
মসিহী লীগ	-	-	০১	০১	০১	০৩
খাকসার তেহরিন	-	-	০২	-	-	০২
জমিয়তে আহলে হাদীস	-	-	০২	-	-	০২
বেলুচিস্তান ইউ. এফ.	০১	-	-	-	০১	০২
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (পাকতুনিস্তান)	-	০১	-	-	-	০১
পাক দরদী সংঘ	০১	-	-	-	-	০১
সিন্ধু ইউনাইটেড ফ্রন্ট (এস.ইউ.এফ)	-	-	-	-	০১	০১
স্বতন্ত্র	১০৯	০৫	১১৪	৪৫	৪৬	৩১৯

* কেন্দ্র শাসিত উপজাতি এলাকা সমূহে প্রাদেশিক পরিষদ না থাকায় পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে ওই এলাকা সমূহে রাজনৈতিক দলের প্রার্থী ছিল না।

তথ্য সূত্রঃ Report on Genaral Elections in Pakistan 1970-71, Election Commission, Pakistan (Islamabad, 1972)pp. 75-100.

গ. নির্বাচনী প্রচারাভিযান

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দীর্ঘ দিনের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও স্বাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ প্রথম থেকেই নির্বাচনী প্রচারাভিযান চালাতে থাকে। কেননা ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের চাইতে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ছিল, পূর্ব বাংলার জনগণের স্বায়ত্তশাসন ও পূর্ব পশ্চিম বৈষম্যের সমাধানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে নির্বাচনী প্রচারাভিযানগুলোতে আওয়ামী লীগ ছয় দফা দাবীকে প্রাধান্য দিতে থাকে।[২৭] ১৯৬৯ সালের ২রা ডিসেম্বর ঢাকায় আয়োজিত এক ইফতার পার্টিতে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আগামী সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব বাংলার জনগণকে ছয় দফা ভিত্তিক স্বায়ত্বশাসন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের দাবীর স্বপক্ষে সুস্পষ্ট রায় ঘোষণা করার কথা বলেন। তবে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতিহারে[২৮] উল্লেখ করা হয় যে, আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক গণতন্ত্র এবং আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। কারণ এটিই পাকিস্তানের সকল জনগণের দাবী এবং "জনগণের নির্দেশই সকল ব্যবস্থার উৎস।"[২৯] আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচারণা ও প্রার্থী মনোনয়ন[৩০] দানের সাথে সাথে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিও ব্যাপকভাবে নির্বাচনী প্রস্তুতি শুরু করে। কিন্তু মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) ছিল নির্বাচন বর্জনের পক্ষে। এ সময় ভাসানী "ভোটের আগে ভাত চাই" শ্লোগান দিয়ে নির্বাচনের বিরোধিতা করেন। কিন্তু দলটির অপর অংশের চাপে ভাসানী ন্যাপ শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে সরকার রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের ম্যানিফেস্টো জনগণের সম্মুখে প্রচারের জন্য রেডিও পাকিস্তান এবং পাকিস্তান টেলিভিশনে বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা করে। এই কার্যক্রমের আওতায় ১৯৭০ সালের ২৮শে অক্টোবর শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দলের পক্ষ থেকে রেডিও এবং টেলিভিশনে এক নির্বাচনী ভাষণ দান করেন। দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এ বক্তৃতায় শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, "প্রকৃত প্রাণবন্ত গণতন্ত্র দেশে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে। গণতন্ত্র ধ্বংসের যে কোন উদ্যোগ পরিণতিতে পাকিস্তানকেই ধ্বংস করবে। আমাদের ছয় দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে ফেডারেশনের ইউনিটসমূহকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন মঞ্জুর করে অঞ্চলে অঞ্চলে সুবিচারের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।" তিনি আরো বলেন,

> "ফেডারেল গণতান্ত্রিক কাঠামোর আওতায় দেশে সামাজিক বিপ্লবের সূচনার জন্যে প্রগতিশীল অর্থনৈতিক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে হবে। আওয়ামী লীগ এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আওয়ামী লীগ দেশবাসীর যে সমর্থন ও আস্থার অধিকারী হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস করি যে, ইনশাল্লাহ আমরা সাফল্যের সাথে এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে সক্ষম হবো।"[৩২]

একইভাবে রেডিও পাকিস্তান ও পাকিস্তান টেলিভিশন থেকে ৫ই নভেম্বর (৭০) তারিখ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী তার বক্তৃতায় বলেন,

> "আগামী সাধারণ নির্বাচনের একমাত্র উদ্দেশ্য পাকিস্তানের সকল শ্রেণীর সকল অঞ্চলের পাঞ্জাবী হোক, সিন্ধী হোক, বেলুচী হোক অথবা বাঙ্গালী হোক সকল শ্রেণীর গ্রহণযোগ্য একটি শোষণ মুক্ত সমাজ কায়েমের উদ্দেশ্যে একটি সুন্দর প্রগ্রেসিভ শাসনতন্ত্র রচনা করা। পাকিস্তান হওয়ার পর হতে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দৈনন্দিন কলহ বৃদ্ধি পাচ্ছে.... আমি আশা করি আগামী শাসনতন্ত্রে আঞ্চলিক পূর্ণ–আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা যথাযথরূপে গৃহীত হবে"।[৩৩]

ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক দলভিত্তিক প্রতীক ঘোষিত হওয়ার পর আওয়ামীলীগসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো তাদের দলীয় প্রার্থীদেরকে জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক নির্বাচনী সফর শুরু করেন। এই একই উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবুর রহমানও নির্বাচনী সফরে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে থাকেন। প্রতিটি বক্তৃতাতেই ছয় দফার পক্ষে নৌকা মার্কায় ভোট দানের জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহবান জানান। তিনি আসন্ন নির্বাচনকে"... শোষকদের কবজা হতে বাংলার স্বাধিকার ছিনিয়ে আনার এক 'চরম লড়াই' বলে আখ্যায়িত করেন।"[৩৪]

জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার জন্য দলের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের কর্মীরাও ব্যাপক নির্বাচনী প্রচারণায় অবতীর্ণ হয়। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামীলীগের মহিলা সম্পাদিকা অধ্যাপিকা বদরুন্নেসা আহমেদ ১৯৭০ সালের ৩রা নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে পূর্ব পাকিস্তানের নারী সমাজকে লক্ষ্য করে বলেনঃ

> দীর্ঘ ২৩ বৎসরের বিরামহীন সংগ্রামের ফল হিসাবে পাওয়া আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে দেশের নারী সমাজের অনেক কিছু করণীয় আছে।... অতীত ঐতিহ্যকে অক্ষুন্ন রাখিয়া আগামী সাধারণ নির্বাচনে পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে নারীগণকেও আগাইয়া আসিতে হইবে। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের পক্ষে নির্বাচনী প্রচার অভিযান চালাইয়া গণ বিরোধী শক্তি সমূহকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন হইতে চিরদিনের মত উৎখাত করার মহান সংগ্রামে নারী সমাজকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।[৩৫] ৪ঠা নভেম্বর (৭০) ঢাকায় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে স্মরণকালের বৃহত্তম মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথির ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচনের প্রাক্কালে দেশের নারী সমাজের দায়িত্বের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে একটি জাতির অর্ধেক অংশকে গৃহকোণে আবদ্ধ রেখে কোন জাতিই উন্নতি করতে পারে না। নারী পুরুষের ভাগ্য রাষ্ট্রীয় জীবনের

> একই সূত্রে গ্রথিত। তাই দেশের সর্ব প্রথম সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে পুরুষদের মত মা বোনদেরকেও বাংলার স্বাধিকার সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে।[৩৬]

এভাবে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান জেলা, মহকুমা ও থানা পর্যায়ে নির্বাচনী জনসভায় অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা দেন। তবে এসব ক্ষেত্রে তিনি শুধু ভোটারদের উপর প্রভাব বিস্তারেই সফল হননি, বরং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন ও ছয় দফা দাবীর পক্ষে জনমত সৃষ্টি করতেও সক্ষম হয়েছিলেন। বস্তুতঃ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দীর্ঘদিনের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও স্বাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আওয়ামী লীগের জন্ম ও সংগ্রামের ইতিহাস শুরু হয়েছিল মুসলিম লীগের সমালোচনার মধ্য–দিয়ে গণতন্ত্রের লড়াইকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। সত্তর সালের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বাঙালীদের স্বায়ত্তশাসনের জন্য আন্দোলনে পাকিস্তানী শোষণ থেকে মুক্তিলাভের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠাকে গুরুত্ব দেয়। নির্বাচন উপলক্ষে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ৫ই নভেম্বর (৭০) দৈনিক ইত্তেফাকে শেখ মুজিবুর রহমানের একটি আবেদন ছাপানো হয়। তাতে তিনি যুক্তিপূর্ণ ভাষায় বলেনঃ

> জনগণের ত্যাগ ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ফল হচ্ছে এই নির্বাচন। সারা দেশ ও দেশের মানুষকে তীব্র সংকট ও দুর্গতি থেকে চিরদিনের মতো মুক্ত করার সুযোগ এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে।... ভোটাধিকারের নির্ভুল প্রয়োগের মাধ্যমে সেই মহাসুযোগ ও দায়িত্ব যদি আমরা কুচক্রীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে পারি, তাহলে কৃষক–শ্রমিক–সর্বহারা মানুষের দুঃখ মোচন এবং বাংলার মুক্তিসনদ ৬ দফা ও ১১ দফা বাস্তবায়িত করা যাবে।

'৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একাই সবগুলি আসনে প্রার্থী দেয়ায় এবং সমমনা রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ে জোটগঠন না করায় তাদের তীব্র রোষের শিকার হয়। ফলে ওই দলগুলো তাদের কর্মসূচী পেশ করার নামে সরাসরি আওয়ামীলীগের সমালোচনায় অবতীর্ণ হয়। ৩১শে অক্টোবর (৭০) পল্টন ময়দানে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী) প্রাদেশিক শাখার সভাপতি মোজাফ্ফর আহমদ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে 'সংগ্রাম বিমুখতা ও আপোষবাদী ভূমিকা' গ্রহণের অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন, আওয়ামী লীগ যে স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্র চায় তা যথার্থ নয়।[৩৭] পূর্ব পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগের প্রধান খাজা খায়ের উদ্দিন তাঁর নির্বাচনী সভায় মন্তব্য করেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে দেশ ইসলামী শাসনতন্ত্র থেকে বঞ্চিত হবে। পাকিস্তান টিকে থাকবে কিনা আগামী নির্বাচন হলো তারই একটি গণভোট।[৩৮] অপরদিকে ধর্মীয় ইস্যু নিয়ে যে সকল দল নির্বাচনে অংশ নিয়ে ছিল তাদের উদ্দেশ্যে

পাকিস্তান পিপলস পার্টি প্রধান জেড এ ভুট্টো মুলতানের এক জনসভায় ভাষণ দান কালে বলেন যে পাকিস্তানে ইসলাম নয়, বরং পুজিবাদই বিপন্ন হয়েছে। তিনি আরো বলেন ইসলাম বিপন্ন হওয়ার ধুয়া শুধু নির্বাচনের জন্য জনগণকে বিভ্রান্ত করার মিথ্যা প্রচারণা মাত্র।[৩৯]

পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি প্রধান নুরুল আমীন বলেন, ভোটের মাধ্যমেই যেমন পাকিস্তান অর্জিত হয়েছে তেমনই তা বিচক্ষণতার সংগে প্রয়োগ না করলে দেশের সর্বনাশ হতে পারে। তিনি মওলানা ভাসানীর 'বিপ্লব, ঘেরাও, জ্বালাও' হুমকিরও[৪০] নিন্দা করেন। 'জয় বাংলা' জয় সিন্ধু' ধ্বনিসমূহের সমালোচনা করে নুরুল আমিন বলেন এতে পাকিস্তানের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়বে।[৪১] ওয়ালীপন্থী ন্যাপ প্রধান খান আব্দুল ওয়ালী খান ৯ই নভেম্বর (৭০) পেশোয়ারে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)কে দেশের দুশমন হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন যে, তাঁর দল কাইয়ুম লীগ প্রধানকে কোন আসনেই জয়ী হতে দেবে না। মওলানা ভাসানীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের কারণ সম্পর্কে সাংবাদিকদের বলেন, তাঁর দলের সঙ্গে ভাসানীপন্থীদের এক মৌন মতভেদ রয়েছে। দেশের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে তাঁর দল শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পন্থায় বিশ্বাসী। পক্ষান্তরে মওলানা ভাসানী হিংসা, ঘেরাও জ্বালাও, নীতির সমর্থক।[৪২]

এভাবে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নেতৃবৃন্দের পরস্পর বিরোধী বক্তৃতা, বিবৃতি রাজনৈতিক বিশৃংখলা দেখা দেয়। ফলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আবদুস সাত্তার ১১টি নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা করে নির্বাচন সম্পর্কে ছয় দফা আচরণ বিধি[৪৩] উদ্ভাবন করেন। এভাবে রাজনৈতিক দলগুলি বেতার টেলিভিশন ও জনসভায় বক্তৃতার মাধ্যমে নির্বাচনী জোয়ারকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল-- ঠিক সেই সময় ১২ই নভেম্বর (৭০) পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় অঞ্চলে এক প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসে কয়েক লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটে।[৪৪] দক্ষিণ বাংলার এই ঘুর্ণিঝড়ের সুযোগ গ্রহণ করে মওলানা ভাসানী, অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ, আতাউর রহমান খান, ওয়ালী খান, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ প্রমুখ এক বাক্যে নির্বাচন পিছিয়ে দেবার দাবী জানালেন। পাকিস্তান জাতীয় লীগের সভাপতি আতাউর রহমান খান নিজে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত নেন এবং দলীয় সকল নির্বাচন প্রার্থীর প্রতি তাঁর পদাঙ্কানুসরণের আহবান জানান। পি.ডি.পি. প্রধান নুরুল আমিনও নির্বাচন স্থগিত রাখার দাবী জানান।[৪৫] ২৪শে নভেম্বর (৭০) মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন পিকিং পন্থী ন্যাপ ওয়ার্কিং কমিটি নির্বাচনে অংশগ্রহণ হতে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার দুইদিন পর ২৬শে নভেম্বর (৭০) দলের সাধারণ সম্পাদক মশিহুর রহমান (যাদু মিয়া) বলেন, নির্বাচন না পিছালে প্রার্থীদের নির্বাচন থেকে সরিয়ে নিতে ন্যাপ বাধ্য হবে।

কিন্তু আওয়ামী লীগ নির্বাচন স্থগিত কিংবা নির্বাচন পিছানোর তীব্র বিরোধিতা করে। আওয়ামী লীগ প্রধান এই সময় ৯দিন ব্যাপী ঘুর্ণিবাত্যা ও জলোচ্ছাস উপদ্রুত এলাকা সফর শেষে ঢাকায় এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে[৪৬] বেদনার্ত হৃদয়ে বলেন, "শক্তিশালী কেন্দ্র" আর "জাতীয় সংহতি'র দোহাইতে অপকর্ম অনেক হয়েছে; এবার বাংলার ভাগ্য নিয়ন্তা বাংলাকেই হতে হবে।"[৪৭] নির্বাচনের ব্যাপারে শেখ মুজিবুর রহমান ঘূর্ণিদুর্গত এলাকায় কয়েক সপ্তাহ পরে এবং অন্যসব জায়গায় নির্ধারিত তারিখেই নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। নির্বাচন হয় ভালো, আর যদি না হয় তবে জাগ্রত জনগণকে আত্মশক্তিতেই সর্বময় ক্ষমতার মালিক হতে হবে। নির্ধারিত তারিখেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কিনা এ ধরনের সকল জল্পনা ও সন্দেহ-সংশয়ের অবসান ঘটিয়ে প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় সাংবাদিক সম্মেলনে[৪৮] সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন দেশের সাধারণ নির্বাচন পূর্বনির্ধারিত তারিখেই অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়াও নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে বলেন যে, নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক এটাই সরকারের কাম্য। শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী কোন কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না বলেও তিনি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন।[৪৯] কিন্তু নির্বাচন কমিশন পূর্ব পাকিস্তানের ঘূর্ণিবাত্যা ও জলোচ্ছাস বিধ্বস্ত এলাকার অবস্থা পর্যালোচনা করে জাতীয় পরিষদের ৯টি ও প্রাদেশিক পরিষদের ১৮টি আসনে নির্বাচন স্থগিত[৫০] রাখেন। জাতীয় পরিষদের বাকী আসনগুলির নির্বাচন পূর্ব নির্ধারিত তারিখেই ৭ই ডিসেম্বর(৭০) অনুষ্ঠিত হয়।

ঘ. নির্বাচনের রায়ঃ ছয় দফার চূড়ান্ত বিজয়ঃ

দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক আন্দোলন ও ত্যাগ তিতিক্ষার ফলে ৭ই ডিসেম্বর ১৯৭০ সালে পাকিস্তানে সর্বপ্রথম জাতীয় পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৯১টি আসনের এবং ঘুর্নিদুর্গত এলাকায় ৯টি আসনে স্থগিতকৃত নির্বাচন ১৯৭১ সালের ১৭ই জানুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাক নির্বাচন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রথম পাতায় সম্পাদকীয় কলামে মন্তব্য করেঃ

> "অবশেষে পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের নির্ধারিত দিবসটি সমুপস্থিত। ইহার পথে বাধা বিপত্তি অনেক আসিয়াছে, দ্বিধা সংশয় অনেক জাগিয়েছে, অনেক হুমকি ও উস্কানি প্রদত্ত হইয়াছে। বিভিন্ন অজুহাতে নির্বাচন অনির্দিষ্টকাল বন্ধ রাখার জন্য প্রেসিডেন্টের উপরও প্রবল চাপ সৃষ্টি করা হইয়ছে। ... বলিতে অত্যুক্তি হইবে না যে, শেখ মুজিব যদি নির্বাচনের দাবীতে অনড়-অটল না থাকিতেন তবে হয়ত ৫ই অক্টোবরের পথেই ৭ই ডিসেম্বর ও অতিক্রান্ত হইত, নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইত না, জনগণের মৌলিক অধিকারটি প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পাইত না।[৫১]

৭ই ডিসেম্বর (৭০) ও ১৭ই জানুয়ারী (৭১) পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন হলে নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় আওয়ামীলীগ এক অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে এবং শুধু পূর্ব পাকিস্তানেই নয় বরং সমগ্র পাকিস্তানে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়।

সারণী ঃ ৩

পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনী ফলাফল

দলের নাম	পূর্ব পাকিস্তান	পাঞ্জাব	সিন্ধু	উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	বেলুচিস্তান	কেন্দ্র শাসিত উপজাতি এলাকা	সংরক্ষিত মহিলা আসন
আওয়ামীলীগ	১৬০	–	–	–	–	–	০৭
পাকিস্তান পিপলস পার্টি	–	৬৪	১৮	০১	–	–	০৫
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	–	০১	০১	০৭	–	–	–
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	–	০৭	–	–	–	–	–
জমিয়ত-উল-উলেমা ই-ইসলাম (হাজারভী গ্রুপ)	–	–	–	০৬	০১	–	–
মারকাজী-জমিয়ত-উল উলেমা-ই-ইসলাম (থানভী গ্রুপ)	–	–	০৪	০৩	–	–	–
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী খান)	–	–	–	০৩	০৩	–	০১
জামায়েত-ই-ইসলামী	–	০১	০২	০১	–	–	–
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	–	০২	–	–	–	–	–
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	০১	–	–	–	–	–	–
স্বতন্ত্র	০১	০৩	০৩	–	–	০৭	
মোট	১৬২	৮২	২৭	১৮	০৪	০৭	১৩

উৎসঃ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল পত্রঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৮৬।

সারণী-৪ হতে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে নির্বাচনে আওয়ামীলীগ ১৬০টি আসনে জয় লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। যদিও পশ্চিম পাকিস্তানের কোন প্রদেশে অথবা জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ কোন আসনে জয়লাভ করেনি। পাকিস্তান পিপলস পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানে চারটি প্রদেশের মধ্যে পাঞ্জাবে ৬৪টি সিন্ধুতে ১৮টি ও পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ১টি আসনে জয়লাভ করে। এতে পাকিস্তান পিপলস পার্টির মোট আসন সংখ্যা দাড়ায় ৮৮টি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে জাতীয় পরিষদের ১৮টি আসনের ৩টিতে এবং বেলুচিস্তানের চারটি আসনের মধ্যে ৩টিতে জয়লাভ করে ওয়ালী খানের নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি

পূর্ব পাকিস্তান হতে একটি আসন লাভ করে। জাতীয় পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা আসন এর পরোক্ষ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে ৭টি মহিলা আসন লাভ করে আওয়ামীলীগ এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৪টি প্রদেশে ৫টিতে জয়লাভ করে পাকিস্তান পিপলস পার্টি। আওয়ামী লীগের এই বিপুল বিজয় পশ্চিম পাকিস্তানী কায়েমি স্বার্থবাদীদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলে। এই নির্বাচনী ফলাফলে পূর্ব পাকিস্তানবাসী বাঙ্গালী জনসাধারণের ছয় দফা কর্মসূচীর প্রতি সমর্থনের বহিঃ প্রকাশ ঘটে।

নির্বাচনে এই বিজয়কে দৈনিক ইত্তেফাকে ভূমিধস বিজয়' (Landslide Victory) বলে চিহ্নিত করে 'অভিনন্দন লহ হে বীর নেতা ও জনতা' শীর্ষনামে – ৮ই ডিসেম্বর (৭০) তারিখের সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়ঃ

> ... এ যেন চুয়ান্ন সালের যুক্তফ্রন্টের বিজয় ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি। কায়েমি স্বার্থের দূর্গ প্রকরণ বিধ্বস্ত। গণতন্ত্রের দুশমন ও ধর্ম ব্যবসায়ীদের সকল ষড়যন্ত্রজাল ছিন্ন ভিন্ন... আমলাতন্ত্রের শিরোমণি-চুড়ামনিদের সমস্ত কারচুপি ধুলায় লুণ্ঠিত। গণ দুশমনদের কোটি কোটি রজত মুদ্রার ঝনঝনানি, পূর্ব বাংলার কণ্ঠকর্তনকারীদের কুটিল কলা-কৌশল ও ছল-চাতুরী, ধর্মব্যবসায়ীদের ধর্মের নামে ধুম্রজাল বিস্তার-কোনটাই পূর্ব বাংলার জাগ্রত জনগণকে এতটুকু বিভ্রান্ত করিতে পারে নাই। জনগণ নির্ভুল পথই বাছিয়া লইয়াছেন এবং ছয় দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের পক্ষে কার্যতঃ সর্বসম্মত রায় দিয়াছেন। সেজন্য জাগ্রত বাংলার তুলনাহীন গণচেতনাকে অভিনন্দন।[৫২]

নির্বাচনের ফলাফল শুধু আওয়ামী লীগের চূড়ান্ত বিজয় ও বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাধান্যই বজায় রাখেনি, বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনা ও ছয়দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে একটি গণভোটের বিজয়রূপে স্বীকৃত হয়। এই বিজয় সম্পর্কে ইংরেজী পত্রিকা The People এর ৮ই ডিসেম্বর (৭০) সংখ্যায় মন্তব্য করা হয়েছিলঃ

> "For Bangladesh it was a case of self determination and for the Awami League it was an acid test of the popularity for the Six-Point Programme."

ঙ. নির্বাচন পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ঃ

১৯৭০ এর নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে পাকিস্তানী শাসকচক্র আওয়ামীলীগের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে রাজি না থাকায় পাকিস্তানে এক রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ঘটনা ঘটে। নির্বাচনের ফলাফলে জাতীয় পরিষদে সংখ্যা গরিষ্ঠ আসনের অধিকারী আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের নতুন সংবিধান প্রণয়নের ক্ষমতাও অর্জন করে। কিন্তু এতে ক্ষমতাসীন পাকিস্তানী সামরিক শাসক ও

পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলি আতংকিত হয়ে পড়ে। তাঁরা জনগণের রায়কে নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। পাকিস্তান পিপলস পার্টি নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ঘোষণা করেন যে, ছয় দফার রদবদল না করা হলে তাঁর দল জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করবে না এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য দলকেও অধিবেশনে যোগ না দেয়ার জন্য পরামর্শ ও হুমকি প্রদান করেন। এই সুযোগ গ্রহণ করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করে পরিষদের বাইরে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় পৌঁছার এক দুরভিসন্ধিমূলক কৌশল অবলম্বন করে। ইয়াহিয়া খানের এ সিদ্ধান্ত বাঙালী জনগণ স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেনি। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে বিস্ফোরণমুখি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২রা মার্চ (৭১) ঢাকায় হরতাল ও ৩রা মার্চ (৭১) সারাদেশে হরতালের ডাক দেন। ৩রা মার্চ (৭১) থেকেই শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন এবং ২৫শে মার্চ (৭১) পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে।[৫৪] এই সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপর প্রবল চাপ আসতে থাকে অবিলম্বে বাংলাদেশের (সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের) স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য। এ পরিপ্রেক্ষিতে ৭ই মার্চ (৭১) রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়াদী উদ্যান) বিশাল জনসভায় ঘোষণা করেন, "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" কিন্তু তখনো তিনি শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা বৈঠকে তিনি যোগদান করেন যা ১৬ মার্চ – থেকে ২৪ মার্চ (৭১) পর্যন্ত চলেছিল। কিন্তু আলোচনা ব্যর্থ হয়। পাকিস্তানিচক্র উপায়ন্তর না দেখে ২৫শে মার্চ (৭১) রাতের অন্ধকারে সামরিক বাহিনীকে দিয়ে নিরস্ত্র বাঙ্গালীদের উপর শুরু করে বর্বরোচিত আক্রমণ এবং ঐ রাতেই আওয়ামীলীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার হবার পূর্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীকে সমূলে উৎখাত করে বাঙালী জাতির চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের জন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।[৫৫] এ স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। নয় মাস ব্যাপী এই যুদ্ধের শেষ পরিণতি ছিল যুক্ত পাকিস্তানের অবসান এবং অভ্যুদয় ঘটে বাংলাদেশ নামক নতুন রাষ্ট্রের।

উপসংহারঃ

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তানের রাজনীতিতে যে নতুন পটভূমির জন্ম দেয়, তারই পরিপ্রেক্ষিতে সংঘটিত হয় মুক্তিযুদ্ধ ও অভ্যুদয় ঘটে ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামক নতুন রাষ্ট্রের। বস্তুতঃ ৭০ এর নির্বাচন ছিল আওয়ামী লীগের কাছে 'ন্যাশনাল প্রাইড' এবং 'ন্যাশনাল আইডেনটিটি' প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। কারণ আওয়ামী লীগ ছয় দফা কর্মসূচী তুলে ধরার পর উচ্চপদে আসীন পশ্চিমা আমলা এবং প্রতিষ্ঠিত পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর সাথে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত পূর্ব বাংলার আমলা এবং কম বেশী রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার বিকাশমান

ব্যবসায়ী ও শিল্প বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেদের বিকাশ ও অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ হিসেবে ছয় দফা কর্মসূচী গ্রহণ করে এর প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে এবং তা বিকাশের তাৎক্ষণিক সুযোগ হিসেবে এই নির্বাচনকে কাজে লাগায়।[৫৬] বস্তুত বাঙালীর জাতীয় জীবনে গণচেতনা জাগাতে মাইল ফলক হিসেবে কাজ করে '৭০ সালের নির্বাচন। কেননা এই নির্বাচন ছাড়া আওয়ামী লীগের পক্ষে সারা দেশ জুড়ে ছয় দফার প্রচারাভিযান চালানো হয়ত সম্ভব হত না। নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পশ্চিম পাকিস্তানীদের দ্বারা যে বাঙালীরা নির্যাতিত ও শোষিত হচ্ছে তা আপামর জনগণের কাছে তুলে ধরতে এবং তার প্রতিকারকল্পে পৃথক আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করতে পেরেছিলেন। ফলে ১৯৭০ এর নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর অনুসৃত নীতির প্রতি বাঙালী জনগোষ্ঠীর অসন্তোষ ও আস্থাহীনতা প্রমাণ করে। কিন্তু নির্বাচনের রায় অনুযায়ী পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে পাকিস্তানী সামরিকচক্র অপ্রত্যাশিত জটিলতার সৃষ্টি করে। জেনারেল ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখেন। ইয়াহিয়া খানের এ ঘোষণা পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে, এ সময় শ্লোগান উঠে "বীর বাঙালী অস্ত্রধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর"। আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপর প্রবল চাপ আসে অবিলম্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা জন্য। কেননা ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনী ফলাফল স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তথা আওয়ামীলীগের পেছনে সংঘবদ্ধ। এ পরিস্থিতিতে ২৫শে মার্চ ৭১ রাতে পাকিস্তানী সেনা বাহিনীর গণহত্যা শুরু করলে ঐ রাতেই বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হবার পূর্বে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার আহবান জানান। বাঙালি জাতি মরণপণ যুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করে।

উৎস ও টীকাঃ

১. কামাল উদ্দিন আহমেদ, 'চুয়ান্ন সালের নির্বাচনঃ স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গে'; সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪–১৯৭১, ১ম খণ্ড, রাজনৈতিক ইতিহাস (ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩) পৃঃ ৪৬৯।

২. নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি এবং নিজামে ইসলামের সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। যুক্তফ্রন্ট গঠনের ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, Rangalal sen, Political Elites in Bangladesh, (Dhaka, University Press Ltd. 1986) pp. 118-211.

৩. যুক্তফ্রন্ট মোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে ২২৩টি আসন লাভ করে। মুসলিম লীগ পায় মাত্র ৯টি আসন। নির্বাচনে মোট প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১২৮৫ জন। উল্লেখ্য যে, ৫ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। এ বিষয়ে আরো দেখুন মোঃ মাহবুবুর রহমান, "১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনঃ নির্বাচনী কর্মকাণ্ডের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা' (আই.বি.এস. জার্নাল ১৪০১ঃ২)পৃঃ ১০৭।

৪। আবদুর রহিম আজাদ ও শাহ রেজা, বাংলাদেশের রাজনীতিঃ প্রকৃতি ও প্রবণতা ২১ দফা থেকে ৫ দফা (ঢাকা, সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৮৭) পৃঃ ৪

৫। আহমেদ, চুয়ান্ন সালের নির্বাচন, পৃঃ ৪৮০।

৬। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাপ্ত বয়স্ক জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৪০ হাজার ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৪০ হাজার এই মোট ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন।

৭। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সম্মিলিত বিরোধী দলীয় প্রার্থী (Cop) মিস ফাতিমা জিন্নাহ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনে আইয়ুব খান পশ্চিম পাকিস্তানে ৭৩.৩% এবং পূর্ব পাকিস্তানে ৫২.৯% ভাগ ভোট পান। অপরপক্ষে, মিস ফাতিমা জিন্নাহ পশ্চিম পাকিস্তানে ২৬.৭% এবং পূর্ব পাকিস্তানে ৪৬.৫% ভাগ ভোট পান। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন Sharif al-Muzahid, Pakistan's Presidential Elections,' Asian Survey, Vol. 5 (June 1965), pp. 240-294 এবং S. A. Akanda, 'The working of the Ayub Constitution and the people of Bangladesh', Journal of The Institute of Bangladesh Studies vol. IV, (1979-80) pp 83-116.

৮। উন্নয়ন ব্যয়ের ক্ষেত্রে দুই পাকিস্তানের বৈষম্য কত বিশাল ছিল তা নিম্নের ছকটি থেকেই স্পষ্টভাবে বুঝা যাবে।

পাকিস্তানে উন্নয়ন ব্যয় ও তাতে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ ১৯৫০–৭০ (মিলিয়ন রূপিতে)

সময়	সরকারী খাত				বেসরকারী খাত						
	পরিকল্পিত				অপরিকল্পিত						
	প.পাক	পূ.পাক	মোট	পূ.পাকের%	প.পাক	মোট	পূ.পাকের%	প.পাক	মোট	পূ.পাকের	মোট	পূ.পাকের%
১৯৫০-৭০	২৪৪৪০	১৯৯৮০	৪৪৪২০	৪৫.০০	৫৯১০	৪৫০	৬৩৬০	৭.১০	৩১৬৩০	১৫৩০	৪১১৬০	২৩.১৫
১৯৬৫-৭০	১০১০০	১১০৬০	২১১৬০	৫২.২৭	৩৬০০	-	৩৬০০	০.০০	১৬০০০	৫৫০০	২১৫০০	২১৫০০
১৯৬০-৬৫	৭৭০০	৬২৫০	১৩৯৫০	৪৪.৮০	২৩১০	৪৫০	২৭৬০	১৬.৩০	১০৭০০	৩০০০	১৩৭০০	২১.৯০
১৯৫৫-৬০	৪৬৪০	১৯৭০	৬৬১০	২৯.৮০	-	-	-	-	২৯৩০	৭৩০	৩৬৬০	১৯.৯৫
১৯৫০-৫৫	২০০০	৭০০	২৭০০	২৫.৬০	-	-	-	-	২০০০	৩০০	২৩০০	১৩.০৪

উদ্ধৃতঃ প্রীতি কুমার মিত্র, "বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৫৮–১৯৬৬ প্রফেসর সালাহ্উদ্দিন আহ্মেদ ও অন্যান্য সম্পাদিত বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭–১৯৭১ (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭) পৃঃ ১২১।

৯। ১৯৬৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী লাহোরে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি সম্বলিত ছয় দফা পেশ করেন। তবে ১৯৬৬ সালের ১৩ই মার্চ আওয়ামী লীগের ওর্য়াকিং কমিটিতে ছয় দফা অনুমোদন এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষনা করা হয়। এ সম্পর্কে আরো দেখুন, টীকা ২৭।

১০। হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল পত্রঃ ২য় খন্ড, (ঢাকা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্যমন্ত্রণালয়, ১৯৮২) পৃঃ ২৯৮।

১১। Dawn (Karachi) 26 March 1969 এবং আরো দেখুন, H. Feldman, The end and the Begining Pakistan 1969-71, (London, Oxford University Press, 1975) p. 13.

১২। হাসান হাফিজুর রহমান, স্বাধীনতা যুদ্ধ, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৮০। বিস্তারিত আলোচনার জন্য Rounaq Jahan, Pakistan Failure in National Integration, (Dacca, Oxford University Press, 1975) p. 187.

১৩। পরবর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের বন্যাজনিত কারনে ৫ই অক্টোবর (১৯৭০) এর পরিবর্তে ৭ই ডিসেম্বর (১৯৭০) সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ধার্য করা হয়।

১৪। দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯শে নভেম্বর, ১৯৭০।

১৫। দেখুন, মযহারুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪) পৃঃ ৫৩৯।

১৬। ১৯৬১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পাকিস্তানের জনসংখ্যা ১১ কোটি ৫০ লাখের কিছু উপরে। ১৯৬১ সালের আদমশুমারীর ভিত্তিতে এই নির্বাচনে পাকিস্তানের উভয় অংশে মোট ৫ কোটি ৬৪ লাখ প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও মহিলা ভোটার ভোটদানের অধিকারী। তন্মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ভোটার সংখ্যা ৩ কোটি ১২ লক্ষ ১১ হাজার ২ শত ৯ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তানে হচ্ছে ২ কোটি ৫২ লক্ষ। বিস্তারিত দেখুন, Population Census of Pakistan, (Karachi, Govt. of Pakistan, Ministry of Home Affairs, office of the Census Commission, 1961) pp. 7-25.

১৭। দৈনিক পাকিস্তান, ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৬৯।

১৮। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ২৮শে মার্চ ১৯৭০ জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণ দেন এবং উক্ত ভাষণে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কিত আইনগত কাঠামো প্রকাশ করার কথা ব্যক্ত করেন এবং ৩০শে মার্চ এই আদেশ প্রকাশিত হয় যা The Legal Framework Order, 1970 নামে পরিচিত।

১৯। হাসান হাফিজুর রহমান, স্বাধীনতা যুদ্ধ, ২য় খন্ড, পৃঃ ৫২০।

২০। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির দু'দিন ব্যাপী জরুরী বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আরো দেখুন, দৈনিক পাকিস্তান, ২রা এপ্রিল, ১৯৭০।

২১। Legal Frame Work Order বা আইনগত কাঠামোর ২৫ এবং ২৭ ধারা ছিল নিম্নরূপঃ

ধারা ২৫ঃ Authentication of constitution: The Constitution Bill, as passed by the National Assembly, shall be presented to the president for authentication. The National Assembly shall stand dissolved in the event that authentication is refuesd.

ধারা ২৭ঃ Interpretation and Amendment of Order, etc. : (a) Any question or doubt as to the interpretation of any provision of this

order shall be resolved by a decision of the President, and such decision shall be final and not liable to be questioned in any court.
(b) The President, and not the National Assembly, shall have the power to make any amendment in this Order.

২২। দৈনিক পাকিস্তান, ৩রা এপ্রিল, ১৯৭০।

২৩। ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ পুনরায় কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৬৪ সালের ২৫শে জানুয়ারী শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে অবলুপ্ত আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সকল সদস্য, জেলা শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের সর্ব সম্মতিক্রমে দল পুর্নগঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বিস্তারিত দেখুন, আবু আল সাঈদ, আওয়ামী লীগের ইতিহাস, ১৯৪৯-১৯৭১। (ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৩) পৃঃ ১৭৭।

২৪। দৈনিক ইত্তেফাক ৭ নভেম্বর ১৯৭০।

২৫। দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ই জুন, ১৯৭০।

২৬। Report on General Elections in Pakistan 1970-71, (Election Commission, Pakistan, 1972) pp 75-100

২৭। ১৯৬৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিবুর রহমান ও তাজউদ্দিন আহমেদের দুটি ভূমিকা সহ 'ছয় দফা' বিবৃতি করে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। ঐ পুস্তিকাটি ১৯৬৬ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবস বিলি করা হয়। এ ছাড়াও ১৯৬৬ সালে ১৮ই মার্চ তারিখে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল 'অধিবেশনে ছয় দফার বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্বলিত 'আমাদের বাঁচার দাবি ঃ ছয় দফা কর্মসূচী' শীর্ষক আর একটি পুস্তিকা প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছিল। টীকা ৯ দ্রষ্টব্য।

২৮। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতিহারে প্রস্তুতির জন্য নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কমিটিতে ৯ই আগষ্ট ১৯৬৯ তারিখে মেনিফেস্টো সাব কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি খসড়া মেনিফেস্টো ৩রা জুন ১৯৭০ তারিখে সাংগঠনিক কমিটির কাছে পেশ করে। তবে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে সংশোধনী অর্ন্তভুক্ত করে মেনিফেস্টো ৬ই জুন ১৯৭০ সালে গৃহীত হয়।

২৯। দেখুন, তাজউদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত)'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামীলীগ নীতি ও কর্মসূচী ঘোষণা (মেনিফেস্টো)' এর তৃতীয় পুণর্মুদ্রণ, (ভূমিকা অংশ)।

৩০। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের তালিকার জন্য দেখুন, খালেদা হাবীব, বাংলাদেশ নির্বাচন, জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রিসভা ১৯৭০-৯১, (ঢাকাঃ এ. আর. মুরশেদ, ১৯৯১) পৃঃ ২৪-২৮।

৩১। 'ভোটের আগে ভাত চাই' এই দাবী উত্থাপন করে মওলানা ভাসানী একটি পুস্তিকা প্রকাশ করলে তদানীন্তন সরকার তা বজেয়াপ্ত করেন।

৩২। দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ই নভেম্বর, ১৯৭০।

৩৩। দৈনিক পাকিস্তান, ৬ই নভেম্বর, ১৯৭০।

৩৪। ৩১শে অক্টোবর (৭০) ঢাকার জয়দেবপুরের বিশাল জনসমাবেশে দেয়া ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বক্তৃতায় এ কথা বলেন। দেখুন, দৈনিক ইত্তেফাক, ১লা নভেম্বর, ১৯৭০।

৩৫। দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৭০।

৩৬। দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ই নভেম্বর, ১৯৭০।

৩৭। দৈনিক ইত্তেফাক, ২রা নভেম্বর, ১৯৭০।

৩৮। খাজা খায়ের উদ্দিন ঢাকা শহরের পুরাতন এলাকা হতে জাতীয় পরিষদের আসনে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

৩৯। দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ই নভেম্বর, ১৯৭০।

৪০। ২০শে অক্টোবর (৭০) করাচীর লিয়াকতাবাদে অনুষ্ঠিত জনসভায় ন্যাপ নেতা ভাসানী বলেছিলেন নির্বাচন দিয়ে কিছু হবে না। তাঁর মতে সমস্যার সমাধান হতে পারে কেবল ঘেরাও, জ্বালাও এর মাধ্যমে ভাসানীর এই মন্তব্যে জনতার একাংশ উত্তেজিত হয়ে সভাস্থল ত্যাগ করে চলে যায়।

৪১। দৈনিক ইত্তেফাক, ১লা নভেম্বর, ১৯৭০।

৪২। দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ই নভেম্বর, ১৯৭০।

৪৩। ১৯৭০ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি জনাব আব্দুস সাত্তার রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃবৃন্দের সহিত বৈঠকে নির্বাচন কালে রাজনৈতিক দলগুলির জন্য একটি ছয় দফা ভিত্তিক নির্বাচনী আচরণ বিধি নির্বাচন করতে সমর্থ হন।

১। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সভায় গোলযোগ বা ভাঙ্গন সৃষ্টির হইতে কর্মী সমর্থক ও সহানুভূতিশীলদের বিরত রাখার জন্য রাজনৈতিক দলসহ চেষ্টা করবে।

২। রাজনৈতিক দলসমূহের নেতা কর্মীদের অন্যান্য নেতাদের উপর নিন্দাসূচক ব্যক্তিগত আক্রমন পরিহার করে চলতে হবে।

৩। জননেতাদের এবং রাজনীতিক শরীক অন্যান্যের দায়িত্ব ও মর্যাদাবোধের সাথে কাজ করতে হবে। নিজেদের মত ও কর্মসূচী প্রচার করতে গিয়ে অন্যান্যের একই অধিকারে হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

৪। কোন দলের নিজেস্ব কর্মসূচী ও নীতির প্রচারনা মূলক প্লাকার্ড ও অন্যান্য চিত্রাদিতে অন্যান্য দলের ব্যক্তিদের প্রতি আক্রমনাত্মক হবে না।

৫। হিংসার আবেদন বা হিংসার হুমকি বা হিংসাত্মক তৎপরতা কঠোরতার সাথে এড়িয়ে চলতে হবে।

৬। জনসভায় মারাত্মক অস্ত্র লওয়া যাবে না এবং এ ব্যাপারে সরকারী বিধি কঠোরতার সাথে পালন করতে হবে। জনসভায় পটকা ও অন্যান্য বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার করা চলবে না। নির্বাচনী আচরণ বিধি প্রণয়ন সম্পর্কিত এই আলোচনায় যে সকল নেতৃবৃন্দ যোগাদান করেছিলেন তারা হলেন জনাব জে. এ. রহিম (পাকিস্তান পিপলস পার্টি) নওয়াব মোজাফফর হোসেন খান (সিন্ধু করাচী মহাজির পাঞ্জারী পাঠান মুত্তাহিদা মাহাজ) মোহাম্মদ সিরাজুল হক, (খাকসার তেহ্‌রিক) কাজী মোহাম্মদ সলিম, (জমিয়ত-ই-উলেমা-ই-ইসলাম) ফকির হোসেন ও এম. আসলাম সিলিম, (জামাতে ইসলামী), এ. এম. সাঈদ, (জামাম আলিয়া মুজাহিদীন) মালিক হামিদ সরফরাজ, (পাঞ্জাব, প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ), খোন্দকার মোহাম্মত এহসান, (তাহরিক-ই-ইসতিকলাল) এ ছাড়া যে সকল দল যোগদান করেনি, সেগুলি হচ্ছে-পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি ও মুসলিম লীগের তিনটি উপদল। এজন্য দেখুন, দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ ও ১২ই নভেম্বর, ১৯৭০।

৪৪। ঘূর্নিঝড় সম্পর্কে সমসাময়িক দুটি পত্রিকার রিপোর্টঃ দৈনিক ইত্তেফাক, (১৫ই নভেম্বর, ১৯৭০) এর মন্তব্য "..... খুলনা হতে কক্সবাজার পর্যন্ত সুবিস্তৃত উপকূলীয় এলাকা ও দ্বীপাঞ্চলের সর্বত্র ছড়াইয়া আছে মৃত্যু আর ধ্বংসের বিভীষিকাময় স্বাক্ষর .... বাংলার উপকূলে নামিয়া আসিয়াছে

মৃত্যুর স্তব্ধতা।" এ ছাড়াও দৈনিক পাকিস্তান (১৯শে নভেম্বর, ১৯৭০) এ প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে, "খুলনা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ২ হাজার ৩৩৮ বর্গমাইল ব্যাপী অঞ্চলের ৬ শতাধিক দ্বীপে প্রায় ৮ লাখ লোক মারা গেছে।

৪৫। দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯শে নভেম্বর, ১৯৭০।

৪৬। আওয়ামী লীগ অফিসে আহুত এবং স্থানাভাবে পরে হোটেল শাহবাগে স্থানান্তরিত এই সাংবাদিক সম্মেলনে প্রায় ৭৫ জন বিদেশী এবং অনুরূপ সংখ্যক দেশী সংবাদপত্র, বার্তা প্রতিষ্ঠান, রেডিও এবং টেলিভিশনের সংবাদদাতা ও আলোকচিত্র শিল্পী যোগদান করেন, কোন জননেতার সাংবাদিক সম্মেলনে এত অধিক সংখ্যক বার্তাজীবির উপস্থিতির নজির এদেশের ইতিহাসে বিরল।

৪৭। দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭শে নভেম্বর, ১৯৭০।

৪৮। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ২৭শে নভেম্বর ১৯৭০ তারিখে সন্ধ্যায় ঢাকায় গভর্ণর ভবনে এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে নির্বাচন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তৃতা দেন।

৪৯। দৈনিক পাকিস্তান, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৭০।

৫০। দূর্গত এলাকার জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের মোট ৩০টি আসনের স্থগিত নির্বাচন ১৯৭১ সালের ১৭ই জানুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা করা হয়।

৫১। দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭০।

৫২। দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭০।

৫৩। The People, 8 December, 1970.

৫৪। মোনায়েম সরকার, "বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস মার্চ ডিসেম্বর ১৯৭১," প্রফেসর সালাহ্ উদ্দিন আহমদ ও অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭–১৯৭১, (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭) পৃঃ ২০৭।

৫৫। ২৫শে মার্চ (৭১) রাতে ঢাকা শহরে পাকিস্তান সেনাবাহিনী গণহত্যা অভিযান শুরু করলে গ্রেফতার হবার পূর্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষনা ওয়ারলেস যোগে চট্টগ্রামে আওয়ামীলীগ নেতা জহুর আহমেদ চৌধুরীর কাছে পাঠিয়ে দেন। এই স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমেই তিনি তাঁর সহকর্মীদের ও দেশবাসীকে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ার আহ্বার জানানঃ

"This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh whereever you migt be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved."

উদ্ধৃতঃ হাসান হাফিজুর রহমান, (সম্পাদিত) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খণ্ড, (ঢাকাঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২) পৃঃ ১।

৫৬। ফাহিমুল কাদির, '১৯৭২ সালের সরকার ও সংবিধানের বৈধতাঃ একটি পর্যালোচনা' আবুল ফজল হক সম্পাদিত রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি পত্রিকা ১৯৮৮, পৃঃ ২৫।

IBS PUBLICATIONS

The IBS has a number of publications: Two annual journals, seminar volumes, books and monographs to its credit.

1. *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies* edited by S.A. Akanda, Vols, I-VI (1976-82); M.S. Qureshi, Vols, VII- XII (1983-89): S. A. Akanda,Vols. XIII-XV (1990-92); M.S. Qureshi, Vols XVI-XX (1993-97); A.H. Shibly, Vol. XXI (1998)
2. *Reflections on Bengal Renaissance* (seminar volume 1) edited by David Kopf and S. Joarder (1977).
3. *ঐতিহ্য–সাহিত্য–সংস্কৃতি (সেমিনার* ভল্যুম – ৩) সম্পাদক এম. এস. কোরেশী (১৯৭৯)।
4. *Studies in Modern Bengal* (seminar volume 2) edited by S. A. Akanda (1981).
5. *The New Province of Eastern Bengal and Assam (1905-1911)* by M. K. U. Mollah (1981).
6. *Provincial Autonomy in Bengal (1937-1943)* by Enayetur Rahim (1981).
7. *The District of Rajshahi: Its Past and present* (seminar volume 4) edited by S. A. Akanda (1983)
8. *Tribal Cultures in Bangladesh* (seminar volume 5) edited by M. S. Qureshi (1984).
9. *বঙ্কিম চন্দ্র ও আমরা,* (সেমিনার ভল্যুম – ৬) আমানুল্লাহ আহমদ (১৯৮৫)
10. *বাঙালীর আত্মপরিচয়* (সেমিনার ভল্যুম ৭) সম্পাদক এস. এ. আকন্দ (১৯৯১)।
11. *Rural Poverty and Development Strategies in Bangladesh* (seminar volume 8) edited by Safar A. Akanda & Aminul Islam (1991)
12. *History of Bengal: Mughal Period. Vol. 1 (From the fall of Daud Karrani 1576 to the death of Jahangir 1627)* also in Bangla, Vol 2... by Abdul Karim (1992, 1995).
13. *The Institute of Bangladesh Studies, an introduction* (1994).
14. *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies: An up-to-date Index* by Md. Shahjahan Rarhi, (1993).
15. আই.বি.এস. জার্নাল (বাংলা) সম্পাদক এম. এস. কোরেশী ১৪০০: ১, ১৪০১:২, ১৪০২: ৩, ও ১৪০৩: ৪; সম্পাদক আতফুল হাই শিবলী; ১৪০৪ : ৫।
16. *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সমস্যা* (সেমিনার ভল্যুম –৯) সম্পাদক : এম. এস. কোরেশী (১৯৯৭)।
17. *Socio-Economic Development of a Bengal District: A Study of Jessore 1883-1925* by Muhammad Muhibullah Siddiquee, (1997).

১৪০৩ঃ৪ সংখ্যার সূচীপত্র

ডঃ শহীদুল্লাহর একটি অপ্রকাশিত পত্র
ডঃ মাহমুদ শাহ কোরেশী

কোটালীপাড়া দূর্গঃ দক্ষিণ বঙ্গের প্রাচীনতম দূর্গ নিদর্শন
ডঃ আয়েশা বেগম

বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলাচর্চায় শিল্পী এস. এম. সুলতান এর অবদান
ডঃ আবু তাহের বাবু

রাজশাহীর বিয়েঃ অনুষ্ঠান ও আনুষ্ঠানিক গীত
এস. এম. গোলাম নবী

চট্টগ্রামে দেওবন্দ আন্দোলন
ডঃ আলী আহমদ

বাংলাদেশের পদোন্নতি ব্যবস্থার নিয়ম ও অনিয়মঃ
১৯৯২ সালের গণ–পদোন্নতির একটি পর্যালোচনা
মিস নাজনীন ইসলাম

প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যঃ রাজশাহী টেক্স্টাইল মিলের উপর একটি সমীক্ষা
মোঃ ওমর আলী

মালিক ও ভাড়াটিয়াঃ বাড়ী ভাড়া গ্রহণে অস্বীকৃতি প্রসঙ্গ
খবির উদ্দীন আহম্মদ

বিংশ শতাব্দীর বাংলা
ডঃ মোহাম্মদ গোলাম রসুল

বিংশ শতাব্দীর বাংলাঃ শব্দের রূপ বৈচিত্র ও বানান বিভ্রাট
ডঃ স্বরোচিষ সরকার

বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে খান বাহাদুর আহছান
উল্লার (১৮৭৩–১৯৬৫) অবদানঃ একটি পর্যালোচনা
ইমরান হোসেন

মির্জা মোহাম্মদ ইউসফ আলীর 'নূর –অল–ইমান সমাজ' ও 'আঞ্জুমানে হেমায়েতে এসলাম'
ডঃ সাইফুদ্দীন চৌধুরী

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উত্তর বাংলার জনস্বাস্থ্যঃ প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনা
ডঃ এম. মাহবুবর রহমান

বাঙালী মুসলমানদের ভাষা সচেতনতার ধারা (১৯৪০–১৯৭০)
ডঃ এম. আবুল কাশেম

স্থানীয় সাহিত্যে ১৯৪৩ সালের রংপুরের দুর্ভিক্ষ
আবু মোঃ ইকবাল রুমী শাহ
ও ডঃ নুরুল হোসেন চৌধুরী

গ্রন্থ পর্যালোচনা
খন্দকার নাইমুল ইসলাম